

পেলের ডায়েরী

জয়ন্ত দত্ত



পেলের ডায়েরী

জয়ন্ত দত্ত

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স। ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৩৮৩
সেপ্টেম্বর ১৯৭৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ
আশ্বিন ১৩৮৯
অক্টোবর ১৯৮২
প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯
প্রচ্ছদ
গৌতম রায়
মুদ্রাকর
প্রফুল্লকুমার বক্সী
জয়দুর্গা প্রেস
৫৩ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৯

১২ টাকা

জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

জুলে রিমে থেকে ফিফা

আমি ভিশ বলছি

দুরন্ত ক্রিকেটার কপিলদেব

আমি পেলে—পেলে বলছি।

—হ্যাঁ, আমি সেই পেলে, যাকে ঘিরে ফুটবলের আসর। যাকে আপনারা বলেছেন ফুটবলের রাজা, বাদশা। কেউ আমায় বলে যাদুকর, কেউ বলে কবি, দার্শনিক, শিল্পী, সুরস্রষ্টা ফুটবলের নতুন সুরের আসরে।

আমি পেলে, আমি চিরকালের ফুটবলার, চিরদিনের ফুটবলার। আমাকে ঘিরে গোটা বিশ্বের একটা স্বপ্ন আছে। আমি খেলা প্রিয় মানুষের চোখে স্বপ্নের রাজা, রাজকুমার। আমি খেলোয়াড় দের বুকে সততার প্রেমিক। আমি হলাম ফুটবলের আদর্শ, নীতি, দর্শন। আমাকে ঘিরে ফুটবল, ফুটবলকে ঘিরে আমি।

আমার বিশবছর খেলোয়াড় জীবনে অনেকে আমায় অনেক প্রশ্ন করেছেন। কেউ বলেছেন, আপনি কি ফুটবলের কোন যাদুমন্ত্র জানেন? আপনি কি হিন্দুদের অবতারের মতো সিদ্ধ? আপনি কি যোগী? আপনি কি যাদুকর? যে যাদুবিদ্যায় গোটা মাঠকে ঘুম পাড়িয়ে রাখেন। আপনি কুসুমের মতো স্নিগ্ধ, কবিতার মতো ছন্দোবদ্ধ। গদ্যের মতো সহজ, সংগীতের মতো সুরেলা, আপনার দু-পায়ের কারসাজি। আপনি ছলনার, আপনি মমতার, আপনি ভালোবাসার। আরো-আরো কত কথা।

অথচ এত কথার মধ্যেও, কেউ আমাকে আমার রক্তমাংসের দেহকে ঘিরে প্রশ্ন করলো না কখনও। জিজ্ঞাসা করলো না—সত্যি করে বলুনতো মশাই, আপনি কে? সবাই যা বলে আপনি কি তাই?

আমি বলবো, আমাকে সবাই যা বলে তা একটু বাড়িয়ে বলে। আসলে আমি আপনাদের মতো একজন সহজ, সাধারণ

মানুষ মাত্র। আমি ফুটবল খেলি এই আমার পরিচয়। আমি একজন ফুটবলার ছাড়া অন্য কিছু নই। আমার অতিরিক্ত এমন কিছু নেই, যা দিয়ে আমি আমার নিজেকে অন্যের চাইতে তফাৎ করতে পারি। সবাই যখন অনেক কথা বলেন, আমি তখন ভাবি আমার নিজের কথা। আমি কি ছিলাম, আর আমি কি হয়েছি। এত কিছু পাওয়ার কথাতো আমার ছিল না। আসলে আমাকে ভালোবেসে ফুটবল প্রিয় মানুষ, অনেক কিছু সম্মানিত উপহার দিয়েছেন। সবাই আমাকে বলেন ফুটবলের রাজা, ব্রেজিলের রাজকুমার, "The hero of international football." বিশ্বের আমি সেরা—আমি পেলে, আমি হলাম কিনা ফুটবলের যাদুকর। ফুটবলের রাজা।

আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি যা খেলি সে খেলা কি সত্যিই কেউ খেলতে পারে না। আসলে ওটা হলো দর্শকদের চোখের ভুল। একদিন যখন তাদের এই ভুল ভাঙবে, তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেবেন আমার ওপর থেকে, ঠেলে দেবেন আমায় ইতিহাসের এক কোণে। আমি তখন শুধু হয়ে থাকবো বাক্যহীন স্মৃতির ছবির মতো।

মানুষের মৃত্যু হয়, একদিন ফুটবলের রাজাও মরবে। কেউ তাকে ধরে রাখতে পারবে না। সেই শূন্য আসনে উঠে এসে বসবে আর এক রাজা, আর এক পেলে—হারিয়ে যাবে এই পেলে যাকে নিয়ে আটান্ন সাল থেকে একাত্তর সাল পর্যন্ত করা হয়েছে এত মাতামাতি। অবশ্য তার জন্য আমি দুঃখিত নই, আমি প্রস্তুত। আমি সব কিছু ছেড়ে দিয়ে বিদায় নিতে চাই আমার পুরোনো নামে, যাবার আগে উন্মুক্তকণ্ঠে বলে যেতে চাই—

"মোর নাম শুধু এই বলে খ্যাত হোক,
আমি তোমাদেরই লোক, আর কিছু নয়
এই মোর শেষ পরিচয়।"

আমি ফুটবলকে ভালোবেসেছি। ফুটবল আমার প্রিয়।

খেলার সময় আমি থাকি ফুটবলের সঙ্গে জড়িয়ে। আমার শরীরটাকে আমি তৈরী করে নিয়েছি ফুটবলের সঙ্গী হিসাবে। ইচ্ছে মতো পারি শরীরটাকে অভ্যাসসিদ্ধ ভঙ্গিতে যেদিকে খুশী বাঁকাতে। একটা বলকে আমি পায়ে করে তুলে নাচাতে পারি বুকের ওপর, শরীর বেয়ে পাক খওয়াতে পারি ডানদিক থেকে বাঁদিকে। আমি খেলার সময় কোন নিয়ম মানতে পারি না। ভুলে যাই আমি কোন্ পজিসানে খেলছি সেই নিয়মের কথা। মাঠে নামলে আমার লক্ষ্য থাকে বলের দিকে। বলকে আমি আমার অনুরক্ত প্রেমিকের মতো বলে মনে করি। ও যেন আমায় ঈশারায় ডাক দেয়, আমি থাকতে পারি না। গোটা মাঠময় তাই বল নিয়ে করি ছোটাছুটি। এখানে ওখানে, ডান দিক থেকে বাঁদিকে, কখনও বা এগিয়ে, কখনও বা পেছিয়ে। সারামাঠে সেখানে বল সেখানেই আমি।

আসলে আমি খেলতে ভালোবাসি। ফুটবল আমার স্বপ্নের, ধ্যানের, কর্মের, আত্মার। আমার ভালোবাসা ফুটবলকে ঘিরে—এইটুকুই যা আমার আছে, তাছাড়া আমি একজন অত্যন্ত সাধারণ, খুব সাধারণ ফুটবলার মাত্র।

আমি রাজা নই, আমাকে যেন কেউ অনুসরণ না করেন। আমায় অনুসরণ করে তারা যেন সব সময় খুঁজে বেড়ান অন্য আর এক পেলেকে, যে পেলে হলেন সত্যিকারে রাজা, আমি তাহলেই হবো সব চাইতে খুশী।

পেলের প্রেমে ডিউক

—আসুন, আপনার সঙ্গে খেলোয়াড়দের পরিচয় করিয়ে দিই। ব্রেজিলের একজন উঁচুদরের ফুটবলের কর্তা এসে বললেন ডিউক'কে।

—না। সংক্ষেপে জবাব দিলেন ডিউক-অফ্-এডিনবারা।

সবাইতো থ। সেকি, ডিউক অফ্ এডিনবারা মাঠে এসেছেন। তারই ইচ্ছাপুরণের জন্য এই খেলার আয়োজন, আর সেই তিনি কিনা মাঠে এসে খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচয় করবেন না? এ আবার কেমনতর কথা! এমনতো হয়নি কখনও। সবাই যে যার দিকে তাকিয়ে মুখ চাওয়া চাওয়ি করলেন। মুখে কিছু বললেন না। কি বলবেন তারা ডিউককে। পাশ থেকে কে একজন আর একজনকে বললেন মিহি গলায়,—ডিউক বলে কথা! ছেড়ে দাও আর কোন অনুরোধ করো না। শেষে হয়তো খেলা না দেখে এমন একটা কিছু কাণ্ড করে মাঠ ছেড়ে চলেই যাবেন। 'He is a very moody man'.

রাতের আঁধারে তখন দিনের মতো উজ্জ্বল আলোয় সেজেছে মারাকানা স্টেডিয়াম। ব্রেজিলের একটা সেরা মাঠ। কানায় কানায় ভরা মানুষ। চারিদিকে অসংখ্য কালো মানুষের হাতছানি। সকলেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন তখন খেলা দেখার জন্য। কেউ বা চাইছেন ডিউকের সুন্দর চেহারাটা একবার দেখতে রাতের বেলায় সাজানো মারকানা স্টেডিয়ামের আলোয়। আলো আর আলো। আলোর বন্যা যেন চারদিকে। দিনের মতন স্পষ্ট সে আলো। যেমন স্বচ্ছ তেমনি উজ্জ্বল।

ডিউক বললেন সকলের দিকে তাকিয়ে—আমি যাকে দেখতে এসেছি, তাকে আমায় নিজেকে চিনতে দিন।

—তার মানে!

—আমি পেলেকে নিজেই চিনে নিতে চাই।

বড় কর্তা ডিউকের দিকে ঝুঁকে বললেন—এত খেলোয়াড়দের মধ্যে আপনি তাঁকে খুঁজে পাবেন কি করে? মাঠে খেলবেন তো বাইশ জন খেলোয়াড়।

হাসলেন ডিউক! বললেন—ভালোবাসার মানুষকে হাজার ভিড়ের মধ্যেও চেনা যায়। যিনি সম্মানের তিনি সকলের চাইতে ভিন্ন হবেন, আমি ঠিক চিনতে পারবো, Let me try first.

—বেশ।

ডিউক এসে বসলেন। ডিউককে ঘিরে ব্রেজিলের কূটনৈতিক মহলের একরাশ কৌতূহলী মানুষ। সকলেই উৎকণ্ঠিত। কৌতূহলের দৃষ্টি নিয়ে অপেক্ষার পালা শুরু হলো ডিউককে ঘিরে। ডিউক বলেছেন তিনি তার প্রিয় আকাঙ্ক্ষিত ভালোবাসার খেলোয়াড় পেলেকে নিজেই চিনে নেবেন। দেখাই যাক, কেমন তিনি পারেন !

বাঁশি বাজল। মাঠে বল নিয়ে নামলেন দুই পক্ষের খেলোয়াড়েরা। খেলার আয়োজন করা হয়েছে স্যাণ্টোসের সঙ্গে বেটাফোগের। দুই দলেই আছেন বাঘা বাঘা খেলোয়াড়। পেলে খেলছেন স্যাণ্টোসের হয়ে। তার ওপর সঙ্গে আছেন পাপে, ডিডি, কুটিনহো, বিপরীত দিকে মাঠে নেমেছেন গ্যারিনচা, বোল্লিনী, জাগালো, আমরিল্ডো।

মাঠে বল পড়ল। বাঁশি বাজল। দর্শকের মধ্যে শুরু হলো উল্লাস। বাইশজন কালো মানুষ, সকলেই প্রায় একই রকম দেখতে। কৌতূহলী পরীক্ষায় রত ডিউককে কিছুই জ়ানানো হলো না, তার আকাঙ্ক্ষিত পেলে কোন্ দলের হয়ে খেলছেন।

বাঁশি বাজল।

এর পা থেকে বল এলো ওর পায়ে, তার থেকে আর একজনের পায়ে, সে বল পেয়ে থ্রু-পাশ করলো আর একজনকে। ঘড়ির কাঁটায় সবে হয়েছে মাত্র এক মিনিট, কি বড় জোড় দেড় মিনিট—না দেড় মিনিট সময়ও পার হয়নি। ডিউক উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—চলুন, আমার তাঁকে দেখা হয়ে গেছে।

সবাইতো থ। ডিউক চিনলেন কি করে তাঁকে। একজন কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলেন, কে—বলুনতো ? ডিউক বললেন—যিনি দশ নম্বর খেলোয়াড় পায়ে বল ধরে, বারো সেকেণ্ডে কাটিয়েছেন তিন জনকে। আমার বিশ্বাস তিনি সেই পেলে ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না। একমাত্র এটা তার পক্ষেই সম্ভব।

সবাই অবাক। অবাক হবার-ই কথা। যে ডিউক কোনদিন

মাঠে পেলেকে এর আগে দেখেননি, সেই তিনি কিনা ঠিক চিনে নিয়েছেন আসল মানুষটিকে। আসলে ডিউকের কথাটাই ঠিক, যাকে ভালোবাসা যায়, তাকে না দেখলেও চেনা যায় প্রথম নজরে। শ্রীরাধিকা তো শুধু বাঁশি শুনেই শ্যামকে চিনেছিলেন। মাঠে আর থাকলেন না ডিউক অফ্ এডিনবারা, অবশ্য পরে তিনি নিজে গিয়েছিলেন পেলের বাড়িতে। করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন—আপনাকে দেখে আমি সার্থক হয়েছি।

প্রাণখোলা সেই কালো মানুষটি হেসেছিলেন লাজুকের মতো। বলেছিলেন—ধন্যবাদ, আপনাকে আমি কোনদিন ভুলতে পারবো না।

গল্পের মতো মনে হয় এসব কথা। ঠিক যেন এক রূপকথার সাগরজয়ী রাজপুত্র তিনি। তাঁকে ঘিরে কত মানুষের কত না জল্পনা-কল্পনা, কত না আদর, অভিমান, কত না উক্তি, কত না গল্প ছড়ানো ফুটবলের পাতায়। তিনি রাজা।—ফুটবলের রাজা। কালোমাথার মণি। সাত রাজার ধন এক মানিক ফুটবলের এক পেলে। একজন প্রবীণ সাংবাদিক বলেছেন—"In the kingdom of soccer, to whose territory all states of world belong, the only king is Pele. Above him majesty only the spiritual power heaven can rule."

সত্যি পেলে একজন রাজা, যে রাজার সীমানা গোটা বিশ্বজোড়া ফুটবলের আসরে। যেখানেই ফুটবল, সেখানেই পেলে। পেলে আছে তো ফুটবল আছে, পেলে নেই তো ফুটবল নেই।

ওই একটা নাম, যেন মন্ত্র! মন্ত্রের মতো কানে ওই নাম শ্রবণ মাত্রই শোনা যায় দর্শকদের মুখে একটি মাত্র কথা—

"সই কে বা শোনাইল পেলে নাম,
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।"

খেলা পাগল সব দেশেই আছে। সব পাগলই এক অসুখেই সমাধিস্থ, সে নাম হলো পেলে। পেলে হলেন ফুটবলের বীজ

মন্ত্র। দিল্লীর লাড্ডুর মতন যিনি তাকে দেখেছেন তিনিও মজেছেন, যিনি দেখেন নি তিনিও মজেছেন। আসলে দেখতে হয় না ওকে, ওর নাম শুনলেই কাজ হয়।

পেলের পায়ে বল নাতো ঈশ্বরের যাহুকাঠি। কেউ বলেন পেলে হচ্ছেন একজন ঈশ্বর, কেউ বা মনে করেন, পেলে একজন অতিমানব। কেউ বা বলেন তিনি যাহুকর। নিশ্চয়ই কোন যাহুমন্ত্রের ইন্দ্রজাল তিনি জানেন, তা না হলে কি করে সম্ভব, এইভাবে গোটা বিশ্বের ফুটবল মাঠকে মায়াময় করে রাখা। ওর পা' হুখানিতে মনে হয় কোনো যাহুমন্ত্র মাখানো আছে। কেউ বা বলেন ওর শরীর ঘিরে কোন গোপন যন্ত্র বসানো আছে। গোটা শরীরটাকে নিয়ে মানুষটা কি ভাবে দোল খায়। গোটামাঠ যেন ভূমিকম্পের মতো দোল খায় ওর দোলুনীর সঙ্গে। ডান থেকে বাঁ, সামনে থেকে পিছনে যখন তখন স্প্রিংএর মতো শরীরটাকে পেলে ঘোরাতে পারেন। তাক লাগিয়ে দিতে পারেন বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের।

যার ফলে পেলেকে বোঝা, পেলেকে ধরা সম্ভব হয় না কারো পক্ষে। পেলের খেলার আর একটা বড় গুণ হলো তিনি দ্রুত জায়গা বদল করতে পারেন, পায়ে বল নিয়ে গোটা মাঠে তিনি চরে বেড়ান বিষধর সরীসৃপের মতন এঁকেবেঁকে। তার আক্রমণ পদ্ধতি কিছুটা ভাঙা-চোরা, খামখেয়ালি, সর্বোপরি মেজাজী। আসলে পেলে হলেন বলের রাজা, বলকে তিনি পায়ের ভাঁজে আটকে রাখেন আঠার মতন।

দক্ষ যাহুকরের মত হু পায়ের মধ্যে বলকে রেখে, অদৃশ্য করার ক্ষমতা রাখেন তিনি। আসলে খেলার মধ্যে এ মেজাজ বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে তার পক্ষে, কারণ তিনি ফুটবলের রাজা। বাদশা তিনি ফুটবলের।

পেলের গোল

বলটা উঁচু হয়ে তখন মালার মতন বাতাসের তরঙ্গ ভেঙে নীচে নামছে। সকলের লক্ষ্য তখন বলের দিকে। সুইডেনের সাতজন খেলোয়াড় তখন সারিবদ্ধ হয়ে পাঁচিলের মত দাঁড়িয়ে আছেন বলের গতি লক্ষ্য করে।

মাত্র তখন পাঁচ মিনিট খেলা হয়েছে। সে দিনটা ছিল রবিবার, ১৯৫৮ সালের ২৯শে জুন। বিশ্বকাপের ফাইন্যাল খেলা। যৌবনের পরিপূর্ণতায় গোটা মাঠ তখন কানায় কানায় ভরা।

বলটা নীচে নামছে। সাত সাতটা মানুষ, সাত দুগুণে চোদ্দটা চোখ তৎপর। লক্ষ লক্ষ মানুষের দৃষ্টি তখন পড়ন্ত বলটার দিকে।

বলটা নীচে নামছে, আরো নীচে। খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আছেন কালো একটা মানুষ, দেখতে তখন লাগছে তাকে ঠিক বোকা ছেলের মতো। দূরে দাঁড়িয়ে ভ্যাবলা ছেলেরা মত তিনি এক হাত কোমরে রেখে, অন্য হাতের কড়ে আঙুলটা দাঁতের ফাঁকে গুঁজে, নখ খাচ্ছেন। দৃষ্টি ওর আর সকলের মতো ওই বলের দিকেই।

বলটা এখুনি মাটি ছোঁবে। সবাই তৎপর। আর ঠিক সেই মুহূর্তে পেলে সেই একই ভঙ্গিতে পিছু হেঁটে দাঁড়ালেন বলের ড্রপ লাইনের কাছাকাছি। কেউ তার সেই নিঃশব্দ পদ সঞ্চালন টের পেলেন না। সরল বোকা একটা ছেলের মতো নিজের গোলের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন পেলে। ওর চাউনির মধ্যে সেই মুহূর্তে নেই কোন উত্তেজনা, নেই অভিসন্ধির দৃষ্টিভঙ্গি। সুইডিস খেলোয়াড়রা সবাই যখন তৈরী বলটা ক্লিয়ার করার জন্য, ঠিক সেই মুহূর্তে পেলে চকিতে বল লক্ষ্য করে সরে গেলেন। বলটা প্রথমে তিনি তুলে নিলেন ডানপায়ের উরুতে। তারপর ব্যাক হেড করে বলটা সামান্য উপরে তুলে নিয়ে, নিজের শরীরটাকে স্প্রিংএর চেয়ারের মতন দ্রুত ঘুরিয়ে নিয়ে পড়ন্ত বলের ওপর চালালেন বাঁ পায়ের জোরালো শট।

কেউ কিছুই বুঝতে পারলেন না ব্যাপারটা কি ঘটল শেষ পর্যন্ত। বর্ষীয়ান অতিজ্ঞ সুইডিস গোলরক্ষক শুধু দেখলেন, জোরালো গোলার মতন গতিতে বলটা তার নাগাল টপকে জড়িয়ে গেছে জালে।

গোটা মাঠ প্রথমে কিছুই বুঝতে পারেনি, বলটা শেষ পর্যন্ত কি হলো। অবনত মস্তকে সুইডিস গোলরক্ষক জালে জড়ানো বলটা 'বার করে আনলেন।

গোটা মাঠ স্তম্ভিত। বিস্মিত। স্টেডিয়ামের উঁচু আসনে বসে সেদিন এই খেলা দেখছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক পিটার লরেঞ্জো! তিনি অভিভূত হয়ে লিখলেন সেই গোলের বর্ণনা—"Pele as agile as any jungle beast and with the supreme balance and composure of a circus star, caught the ball of on his right thigh. He flicked it up on to his left, upon his head, a back header and then he turned, as if spun round on a revolving chair, to volly a tremendous shot past the graping fingers of veteran Swidish gole-keeper........"

শুধু এই একটি নয়, দিলেন আর একটি অভাবনীয় গোল। পঁয়তাল্লিশ গজ দূরে থেকে ডান পায়ের ওপর বল রেখে ডজ করলেন প্রথমে তিনজনকে, তারপর বল নিয়ে মাঝ মাঠে ছুটে গিয়ে বাঁ পায়ে বল রেখে ঝুঁকলেন সামনের দিকে, ফলে চার্জিং প্লেয়ার বেচারি পড়লেন মাটিতে মুখ থুবড়ে। আর সেই সুযোগে পেলে তীব্র গতিতে এগিয়ে গিয়ে সুইডিস গোলরক্ষককে পায়ের ওপর লুটিয়ে নিয়ে, আলতো ভাবে বলটা ঠেলে দিলেন একেবারে ফাঁকা গোলে।

এই খেলায় ব্রেজিল জিতল পাঁচ-দুই গোলে। দিনের সেরা খেলোয়াড়ের কাপটা তুলে দেওয়া হল তার হাতে।

বিশ্বকাপ সহ, সেরা খেলোয়াড়ের সম্মান নিয়ে ১৯৫৮ সালে ঘরে ফিরলো, দি গ্রেট ফুটবল টিম অফ ব্রেজিল। পেলে-দি-গ্রেট। দি-কিং-অফ্ ফুটবল। সিম্বল-অফ্-দ্য-গ্রেট-ফুটবলার।

নেমেই মাঠের সেরা

অবাক হয়ে ভাবতে হয় ১৯৫৮ সালে সুইডেনের বিশ্বকাপের, ফুটবল আসরে যে খেলোয়াড়টি হলেন সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত, তিনিই কিনা ব্রেজিলের প্রথম দুটি খেলার আনকোরা খেলোয়াড়ের মতো ড্রেস পরে হাত পা গুটিয়ে বসেছিলেন মাঠের বাইরে।

তখন কে জানতো তাকে, কে চিনতো। একজন অতিরিক্ত খেলোয়াড় না খেলোয়াড়। কেউ তার দিকে ফিরেও তকোতো না। মাঠের বাইরে বসে খেলা দেখতেন পেলে। বুকের মধ্যে ছিল ছটফটানি। পা জোড়া নাচতো বলের আশায়, কিন্তু কে তাকে খেলাবে, কে নেবে এত বড় একটা রিস্ক, একটা আনকোরা সতেরো বছরের অনভিজ্ঞ খেলোয়াড়কে খেলিয়ে। আর কার জায়গায় বা তাঁকে দলে স্থান দেওয়া হবে। সবাই তো নাম করা খেলোয়াড়। সেদিন ব্রেজিলের হয়ে মাঠের বাইরে সেজেগুজে শুধু পেলে একাই বসেছিলেন না, ছিলেন আর একজন বিশ্বজয়ী ফুটবলার গ্যারিনচা।

দুটি যুবক, দুজনেই যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ। খেলার জন্য তাদের বুক জোড়া আকাঙ্ক্ষা অথচ ঠাসা দল, বুনুনি একটু শিথিল করার কোন উপায় নেই এক্সপেরিমেণ্ট হিসাবে।

শেষে পুল লীগের খেলায় কোচ ফিওলার মনটা কেমন যেন হলো এই দুই যুবকের প্রতি। অনেক ভেবে চিন্তে একটা সুযোগ হিসাবে তিনি তাদের দলে নিলেন।

মাঠে নামলেন পেলে, ব্রেজিলের জামা গায় দিয়ে। এই প্রথম তার এক নম্বর টিমের হয়ে খেলা এবং সেই থেকে যতদিন তিনি খেলেছেন ততদিন পর্যন্ত তার আসন ছিল পূর্ণ। কেউ তাকে সরাতে পারেনি।

প্রথম দিন মাঠে নেমে অসাধারণ এক ক্রীড়া নৈপুণ্যের পরিচয়

দিলেন পেলে। সবাই প্রথমে কিন্তু কোচ ফিওলাকে অনেক কথা শুনিয়েছিলেন এই দুই তরুণ খেলোয়াড়দের খেলাবার জন্য। কেউ বলেছিলেন—ফিওলা ভুল করছেন, এইসব ভারি খেলায় কিছুতেই আনকোরাদের সুযোগ দেওয়া উচিত নয়! শেষে কি করতে কি হয়ে যাবে, গোটা দলটাই যাবে হেরে।

ফিওলা একরোখা। যা বলা তাই কাজ। ওরা দুজনেই খেলবে। টিম হারবে হারুক, তবু একটা সুযোগ দেওয়া যাক না এই দুজনকে।

খেলার শেষে ফিওলা ছুটে গিয়েছিলেন মাঠে। দুই খেলোয়াড়কে দুই হাতে নিয়ে ফিরে এসেছিলেন। যারা তাকে বিরূপ মন্তব্য করে-ছিলেন, তাদের উদ্দেশ্য করে ফিওলা বলেছিলেন—কেমন দেখলে আমার দু'হাতের দুই সোনার ছেলেকে। এরা দুজনে হবেন গোটা ব্রেজিলের ভবিষ্যৎ, দেখবে একদিন গোটা বিশ্বের তাক লেগে যাবে।

ফিওলার মুখের কথার ফল ফলতে দেরি হয়নি। পরের খেলায় ব্রেজিল খেললো কোয়ার্টার ফাইন্যাল ওয়েলসের বিরুদ্ধে।

প্রথমে থেকে খেলা চলেছিল জোর কদমে। উত্থান পতনের সে এক চরম খেলা। দর্শক আসন কানায় কানায় ভরা।

বল পড়লো পেলের পায়ে। বল পায়ে নিয়েই সতেরো বছরের এই তরুণ খেলোয়াড় শুরু করলেন দৌড়। পিছনে ছুটেছিল তিনজন ওয়েলসের খেলোয়াড়। এক সময় সবাই দেখল বলটা পেলের পায়ে নেই, ছুটতে ছুটতে কখন তিনি ঠেলে দিয়েছেন পাশের খেলোয়াড়কে। চকিতে লক্ষ্য ভ্রষ্ট। কে কি করবেন ভেবে পেলেন না। কিছু বোঝাবার আগে বিশ গজ দূর থেকে রানিং থ্রু পাসের ওপর চালালেন ভারি ওজনের গড়ানো শট। বল বারের এক কোণ দিয়ে ঢুকে গেল জালে। গোল—গোল—গোল দিয়েছেন পেলে। সবাই ছুটে এলেন, চমৎকার, পিঠ চাপড়ালেন সতীর্থেরা। কেউবা বললেন—সাবাস ভাই! এলেম আছে ছোকরার। হবে, ওর কিছু হবে একদিন।

মনে মনে হাসলেন পেলে।

ওই একটা গোলের জোরে ব্রেজিল জিতলো খেলা। এবার সেমি-ফাইন্যাল। ব্রেজিলকে এবার শক্ত হাতে লড়তে হবে। খাস জুলেরিমের দেশ, মঁসিও সাহেবদের সঙ্গে খেলা। সবাই ভেবেছিল ফ্রান্স জিতবে। জোরদার টিম তখন ফ্রান্সের। বড় বড় খেলোয়াড় আছেন ওদের দলে।

মাঠে নামলো ব্রেজিল!

খেলার শুরুতেই ব্রেজিল করলো গোল। আঠারো মিনিটের মাথায় পেলের পায়ে পড়লো সর্বনাশা বল। বল নিয়ে পেলে পায়ের ভাঁজে নাচতে নাচতে ছুটলেন। চারিদিকে তার চোখ। একদিক থেকে কেউ এলে তিনি অপদিকে সরে যান বল সমেত। গোটা মাঠ যেন পেলের পায়ের তালে নাচছে। জিপসি নাচের মতো তরঙ্গ তালে। মোট ছজনকে একটানা ডজ করে, গোল দিলেন পেলে। তারপর আবার দিলেন আর একটা গোল। ব্রেজিল নাক উঁচু ফ্রান্সকে হারালো পাঁচ গোলে।

সবার মুখে একটি নাম পেলে, ফুটবলারের মতো ফুটবলার। কোথায় ছিল এতদিন এই সতেরো বছরের তাক লাগানো ছোকরা। এর পর সেই ২৯শে জুন রোজাণ্ডা স্টেডিয়ামে ফাইন্যাল খেলার আসর বসেছিল সুইডেনের বিরুদ্ধে। এই খেলায় পেলে দিয়েছিলেন সেই অনবদ্য ঐতিহাসিক গোল যা দেখে পিটার লরেঞ্জো অভিভূত হয়ে বলেছিলেন—"এ খেলা না দেখলে আমার জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যেত। পেলেকে আমি সেই গোলের পর আমার স্ত্রীর চাইতেও বেশী ভালোবেসেছিলাম।"

পেলে খেলার রাজা, টাকার নয়

'টাকা দিয়ে শুধু মাথা কেনা যায়, হৃদয় যায় না কেনা।'। বাংলা দেশের এক কবির এই কথা আজ পেলের কথা লিখতে বসে মনে পড়লো।

বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হবার পর সবাই দূর দেশ থেকে পেলেকে ধরার জন্য টাকা ভর্তি থলি ছুঁড়ে দিয়েছিল যে যার নিজের দেশের জন্য। পেলে, পেলেই বটে! প্লেয়ার বটে! খেলা পাগল তিনি এক মানুষ। টাকা তিনি চান, তবে তা অভাব মেটাতে লাগে যতটুকু, তার বেশী নয়। ইতালীর জুভেন্টাস ক্লাব ছুঁড়ে দিল প্রথমে পেলেকে এক বিরাট টাকার অঙ্ক। টাকায় কি না হয় এই ছিল ওদের ধারণা। টাকার পরিমাণ গোটা ইতালীর অর্ধেক অংশ। টাকা মানে অনেক টাকা—যে টাকার লোভ থেকে মানুষ নিজেকে সামলাতে পারে না বড় একটা।

ইথার তরঙ্গে খবর এলো। টেলিফোন বাজলো। সব ঝুট হ্যায়—চিৎকার করে উঠলেন পেলে। টাকা—টাকা দিয়ে তিনি কি করবেন। তিনি খেলোয়াড়, টাকার হিসাব রাখবে তার হয়ে কে—এক আধ টাকা নয়, উনিশ লক্ষ্য টাকা।

প্রত্যাখান করলেন পেলে। বললেন হাসি মুখে—টাকা আমি চাই না। আমি ফুটবল চাই।

শুধু ইতালী কেন তার ডাক এসেছিল পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। সবাই তাকে দিতে চেয়েছেন মুঠো মুঠো টাকা। তিনি যত চান তত টাকা পাবেন। আপ-টু-ইজ-স্যাটিস-ফ্যাকশান। তার সামনে রাখা হয়েছে ব্ল্যাঙ্ক চেক। বলা হয়েছে ইচ্ছে মতন তিনি যে অঙ্ক লিখে দেবেন, তাই পাবেন।

রাজি হন নি পেলে। খেলেছেন নিজের দেশের হয়ে। ফুটবল হলো তার কাছে আদর্শের, প্রেমের, ন্যায়ের, নীতির।

বিস্মিত আজ জগৎ! টাকার অভাব তার কি আছে? তার মাসিক আয়, আর নিজের দেশের প্রেসিডেন্টের তুলনায় তিনগুণ বেশী। টাকা তার দু'পকেটে। টাকা তাকে দিয়েছে নিজের দেশের মানুষ, অন্যে কি তাঁকে আর দিতে পারবে।

বরং এর বদলে পেলে পেয়েছেন এক চরম জনপ্রিয়তা, যা পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রনায়কের ভাগ্যে জোটেনি। সকলের মুখে মুখে

তার নাম। দেশে দেশে যেখানে খেলা হচ্ছে ফুটবল, সেখানেই সবাই বলেছে পেলের নাম। পা নয়তো যেন সোনার যাদুকাঠি।

কলকাতা ময়দানে কোন এক জনপ্রিয় ক্লাবের খেলা দেখতে গিয়ে শুনেছিলাম এক ছোকরা দর্শকের উক্তি—'আহা, যেন পেলে খেলছে।'

ছোকরার দিকে তাকিয়েছিলাম! আমি তখনও পেলেকে দেখিনি। শুধু আমি কেন আমার মতন না দেখার মানুষ ছিলেন অনেক যারা শুধু তার নামটা শুনেছে, নামটাই যেন ওর মন্ত্র।

ছেলেটার কথায় মনে পড়েছিল—একটা কালো আদমির কথা। নিজের মনে কবির ভাষায় বলেছিলাম—"কালো, তা সে যতই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ।"

সেই কালো হরিণ চোখ দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। কলকাতার ময়দানে আমরা ফুটবলের প্রদীপ জ্বালিয়ে চুনী জহরত চিনেছি, দেখেছি। কিন্তু কলকাতার ময়দান, স্পর্শ পাইনি সোনার যাদুকাঠির। যাদুকর পেলেকে পেলের মতো কাউকে পাইনি দেখতে। এটাই হচ্ছে আমাদের একমাত্র আপসোস, কলকাতা ফুটবলের অতৃপ্তি!

আমি আর খেলবো না

১৯৫৮ সালের বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড় পেলে ১৯৬৪ সালে কান্না ভরা গলায় বললেন—"ওরা আমাকে মেরে মাঠের বাইরে বার করে দিয়েছে, এর জন্য আমি দুঃখ করি না। দুঃখ হয় আগামী ফুটবলের কথা ভেবে। যে ফুটবল ছিল নির্মল আনন্দের, সে আজ হয়ে উঠেছে শক্তি পরীক্ষায় গায়ের জোরের আসর। ফুটবলে আনন্দের বদলে এনেছে বীভৎস রস। ফিফার উচিত ভবিষ্যৎ পেলেদের বাঁচানো।"

কথাগুলো সেকিন পেলে বলেছিলেন অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে-অভিমানে।।

এতদিন তিনি ফুটবল খেলতেই নেমেছিলেন মাঠে। ফুটবল খেলছেন তিনি মনের আনন্দে, নিজের আদর্শে। কারো গায়ে গা লাগিয়ে খেলাকে পছন্দ করতেন না পেলে। খেলতেন সব সময় গা বাঁচিয়ে ফাঁকায় ফাঁকায়।

১৯৬৬ সালে ইংল্যাণ্ড চেয়েছিল বিশ্বকাপের আসর থেকে ব্রেজিলকে হটিয়ে দিতে। এমনিতে তো পারা যাবে না, অতএব গায়ের জোরে খেলতে হবে। যে করেই হোক পেলেকে সরাতে হবে। কেড়ে নিতে হবে ওর মাথা থেকে বিশ্ব খেতাবের মুকুট। ব্রেজিলকে হারাতে হলে চাই পেলেকে সরানো। পেলে যতক্ষণ মাঠে থাকবেন ততক্ষণ কারো সাধ্যি নেই ব্রাজিলকে হারানো। অতএব আগে থেকেই ইংল্যাণ্ড যড়যন্ত্র করে রেখেছিল সে বছর বিশ্বকাপে।

সে বছর ইংল্যাণ্ডে পৌঁছেই হয়ত বা বাতাস বুঝেছিলেন পেলে। পেলেকে ছেড়ে সাংবাদিকেরা সাজানো নিয়মে ঘুর ঘুর শুরু করলেন ইউসোবিওর পিছনে। ক্লিক-ক্লিক—শুধু ছবি আর ছবি। ইংল্যাণ্ডের পত্র-পত্রিকায় ইউসোবিওর ছবিতে আর প্রশংসায় ভরিয়ে দেওয়া হলো। মুখে মুখে প্রচার করা হলো—"পেলে আজ শুধু একা নয় ফুটবল জগতে। পেলের চাইতেও বড় হলেন ইউসোবিও।"

কোন কথায় কান দিলেন না পেলে। কান দিয়ে কি লাভ। ইংল্যাণ্ডের চিরকালের স্বভাব হলো অপরকে ঈর্ষা করা। ঈর্ষার জন্য এরা একজনকে নিচু করে, অন্যজনকে বীর সাজাতে দ্বিধা করে না।

বিশ্বকাপের প্রাথমিক খেলার আসর বসল চিলিতে। প্রথম খেলায় স্যাণ্টোস জিতেছে ৩-২ গোলে। ফিরতি লীগের খেলা। জমাটি আসর। হাজার হাজার মানুষের চোখের ওপর শুরু হলো ফুটবলের বিচারের পালা।

আলোয় ঝলমল করছে গোটা মাঠ। মাঠ নয় তো যেন আলোর বন্যায় মাতামাতি। এই খেলায় পেলে করলেন তিন তিনটি গোল।

মোট ৫-২ গোলে জিতলো স্যান্টোস। ঝড়ের বেগে হলো সে খেলা। খেলা নয়তো ভেল্কি। প্রাথমিক লীগের পর ব্রেজিলকে যেতে হলো চিলির রাজধানী স্যান্টিয়াতে খেলতে। প্রথম খেলায় মেক্সিকোকে হারাতে পারলো না ব্রেজিল। খেলার ফলাফল দাঁড়ালো ১—১। দ্বিতীয় খেলা চেকোশ্লোভিয়ার বিরুদ্ধে।

খেলা শুরু হলো প্রথম থেকেই বেশ জোর ঝাঁপ তালে। দুই পক্ষই খেলছে খুব ওঠানামা করে। ২৫ মিনিটের মাথায় পেলে এগিয়ে গেলেন বল নিয়ে, এক দুই করে কাটালেন তিনজনকে। তারপর একা গোলকিপার। ফুটবলার হলেও পেলে একজন মানুষ। খেলা তার পেশা হলেও, মানবিক বোধটুকু তিনি ভুলতে পারলেন না। গোল-কিপার এমনভাবে ঝাঁপ দিলেন পেলের পায়ের ওপরে যে, পা চালালে সোজা বুট শুদ্ধ পাটা লাগতো তার মুখের ওপর। নিরুপায় পেলে গোল করার চেষ্টা না করে, গোলকিপারকে বাঁচাবার জন্য দিলেন মস্ত এক লাফ। একজনকে নির্ঘাত আহত হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে গিয়েই আহত হলেন তিনি নিজেই। বার পোস্টের সঙ্গে ধাক্কা লাগলো, আঘাত লাগলো তার সোনার জাদুর পায়ে। আহত হয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি মাঠের বাইরে। আর ফিরে এলেন না লীগের খেলায়, খেলার জন্য। পেলে নেই, চিলির ফুটবল আসর যেন ঝিমিয়ে পড়লো। পেলে নেইতো কার পায়ে বল পড়লে দর্শকেরা চিৎকার করবে মরিয়া হয়ে। পেলে বিহীন ব্রেজিল দল তবু বিশ্বকাপের প্রাথমিক খেলায় জয়ী হলো। পেলো তারা বিশ্বকাপে যোগদান করার ছাড়পত্র।

৬৬'র জুলেরিমে ইংল্যাণ্ডের ফুটবল সাজালো। পৃথিবীর আনাচে কানাচে থেকে আসতে লাগলো বিশ্বের সেরা দলগুলি।

ইংল্যাণ্ডের মাঠে খেলা। দলে আছেন সে বছর ইংল্যাণ্ডের ববিমুর, ববি চার্লটনের মতন খেলোয়াড়।

বিশ্বকাপের জমজমাটি আসর শুরু হবার আগে ইংল্যাণ্ড এক প্রদর্শনী খেলা খেললো ব্রেজিলের সঙ্গে। খেলা হলো ব্রেজিলের রাজধানী রিওতে।

মারাকানা স্টেডিয়াম। হাজার ঝাড়লণ্ঠন উঠল জ্বলে। ফুটবলের ঘরে জ্বালানো হলো হাজার বাতি। দিনের আলোর মতন গোটা মাঠ চকচক করছে। সোনা রঙের মতো লাগছে রাতের বাতির আলো। ৬৪ সালের ব্রেজিল আর সেই আগের ব্রেজিল নেই। গোলকিপার গিলমার, ভাভা আর পেলে ছাড়া বাকি সবাই প্রায় উঠতি। সুযোগ বুঝে দাঁও মারার চেষ্টা করলো ইংল্যাণ্ড। কিন্তু দুর্ভাগ্য ইংল্যাণ্ডের এক পেলেতেই এগারো। গোটা ইংল্যাণ্ড দল গোলপোস্ট আড়াল করেও ঠেকিয়ে রাখতে পারলো না পেলেকে। মোট ৫-১ গোলে জিতলো ব্রেজিল। পেলে খেললেন এক অভাবনীয় দুরন্ত খেলা। ববিমুরের মতন খেলোয়াড় বার চারেক পেলেকে আটকাতে গিয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়লেন। পাঁচটি গোলের' মধ্যে পেলে নিজে গোল করলেন একটি, বাকি চারটি গোল হলো তার বাড়ানো লম্বা পাশ থেকে। পেলের পায়ে যেন যাদুকাঠির ছোঁয়া আছে, আছে কোন গোপন ইন্দ্রজাল। ভাঙাচোরা দল নিয়ে এক পেলেই জিতিয়ে দিলেন ব্রেজিলকে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। ১৯ মিনিটের মাথায় বল নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে নিজেই বলটা উঁচু করে সেণ্টার করলেন পেলে। তারপর নিজে ছুটে গিয়ে সেই বলে করলেন হেড। ১৫ গজ দূর থেকে তার তীর বেগে হেড করা বলটা গিয়ে পড়লো সোজা জালে। হতভম্ব সকলে। এই খেলার শেষে ইংল্যাণ্ডের দলপতি ববিমুর বলেছিলেন আবেগ মেশানো গলায়—"ব্রেজিলের দল থেকে নাও না তোমরা পেলেকে সরিয়ে, দেখ না তারপর আমরা জিততে পারি কিনা। কিন্তু পেলে দলে থাকলে আমরা অপারক। উনি একজন অতিমানব, ঐশ্বরিক ক্ষমতা-সম্পন্ন পুরুষ।"

সেই সন্ধ্যায় খেলা শেষ হবার পর প্রখ্যাত সাংবাদিক পিটার লরেঞ্জ বলেছিলেন—"এই সন্ধ্যায় আমি একজন যাদুকরের যাদুবিদ্যা দেখে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম।" পরে তিনি আরো সুনিপুণ ভাষায় বললেন—"Pele, that night as in stockholm and in Lisbon, become the perfect footballer. We saw,

Puskas, Di Stefano, Greaves and Hidegkuti rolled into one."

অপূর্ব—কবিতার মতন ছন্দময় ছিল সেদিন পেলের খেলা। পেলে চিরদিন কবিতার মানুষ। তার ফুটবলের ধরন ছিল কাব্যের মতো ছন্দময়, গীতময়।

দেশে ফিরে গেল গো-হারান হারা ইংল্যাণ্ড দল। এক আধটা গোল নয়, পাঁচ পাঁচটা গোলে হারা। মন থেকে তারা সে রাগকে ধুয়ে মুছে ফেলতে পারে নি। তাই বিশ্বফুটবল আসরে করলো কারিকুরি। তাদের প্রতিজ্ঞা, যে করেই হোক ব্রেজিলকে হারাতে হবে। পেলেকে খেলতে দেওয়া হবে না।

১৯৬৬ সালে বিশ্বকাপ খেলতে নামলো ব্রেজিল। হারালো বুলগেরিয়াকে। প্রথম গোল করলেন নেহাতই সহজ ভঙ্গিতে যাত্বকর পেলে, দ্বিতীয় গোল করলেন গ্যারিঞ্চা। ৬৬'র বিশ্বকাপে প্রথম গোলের স্মূচনা হলো পেলের গোল দিয়ে। পরের খেলায় ব্রেজিল হারালো হাঙ্গেরীকে। চোখ টাটালো ইংল্যাণ্ডের।—কি হচ্ছে কি—ব্রেজিলকে হারাও, যে করেই হোক ওদের বাতিল কর।

প্রথম খেলাতেই শুরু হয়েছিল বিশ্বকাপে পেলেকে মারধোর। নির্মমভাবে সেদিন বুলগেরিয়ান দল ঠেঙালো পেলেকে। এক সাথে চারজনে ঘিরে ধরে—কেউ জামা টানল, কেউ প্যাণ্ট, কেউ বা পিছন থেকে পা ধরে টানলে, কেউ বা শুরু করলেন বল সমেত পেলের সঙ্গে ধস্তাধস্তি। আসল কথা ওদের পেলেকে আটকাতে হবে। পেলেকে যে করেই হোক মাঠের বাইরে পাঠাতে হবে। নির্মম ভাবে মার খাওয়া সত্ত্বেও পেলে কিন্তু উত্তেজিত হন নি। মার খাওয়া সত্ত্বেও খেলেছিলেন। কেঁদেছিলেন পরে মাঠের বাইরে গিয়ে।

পরের খেলায় আহত হওয়া সত্ত্বেও মাঠে নেমেছিলেন পেলে পর্তুগালের সঙ্গে খেলতে। বিপক্ষে খেলছেন তরুণ ইউসোবিও। ইউসোবিও তখন আর একটি নাম, গোটা বিশ্বকাপ জুড়ে তাকে নিয়ে চলেছে মাতামাতি। এই খেলায় ব্রেজিল হারালো। দারুণ

খেললেন ইউসোবিও। তুখড় খেলা। দুরন্ত সে খেলার ভঙ্গি। পেলে সেদিন মাঠে ছিলেন অসহায় শিশুর মতন। তাকে পর্তুগালের খেলোয়াড়েরা প্রথম থেকেই শুরু করলেন ফাউল করতে, পায়ের সঙ্গে পা জড়িয়ে খেলতে। শেষ পর্যন্ত পেলেকে আহত হয়ে মাঠ থেকে বেরিয়ে যেতে হলো। হারলো ব্রেজিল, ফুটবলের রাজার দেশ। চোখের ওপর দলকে হারতে দেখে আহত পেলে ডুগরে কেঁদে উঠলেন। বললেন—"আমি একদম অসহায় হয়ে পড়েছি, আমি ভাবতে পাচ্ছি না ব্রেজিল বিশ্বকাপ ফাইন্যাল খেলছে না।" পরে তিনি আবেগ মিশ্রিত স্বরে বললেন—"হারার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে না, শুধু আফসোস হচ্ছে, আমাকে খেলতে দেওয়া হলো না। আমাদের ফুটবল ফেডারেশন যদি আগামী বিশ্ব-চ্যামপিয়ানশিপের জন্য আমাকে মনোনীত করে, সেখানে আমি অনুপস্থিত থাকবো। কারণ আদর্শ ফুটবল খেলা এখন আর সম্ভব নয়।"

ব্যর্থ মনে ফিরে গেল ব্রেজিল দল। বিশ্বকাপ থেকে ব্রেজিল সরে যাওয়ায় সে বছর ইংল্যাণ্ড নিজের দেশের মাটিতে বুদ্ধির কারিকুরিতে জয় করলো জুলেরিমেকে।

দেশে ফিরতেই সাংবাদিকরা ছেঁকে ধরলেন পেলেকে। আবেগ-প্রবণ গলায় পেলে তাঁদের বললেন—'আমায় প্রশ্ন করবেন না, আমার বলতে লজ্জা করছে আমরা জুলেরিমে ঘরে আনতে পারিনি।'

শুধু তাই নয়, সবশেষে তিনি দুঃখ করে বললেন—'I am dead. আমি শেষ হয়ে গেছি, আমার আর কিচ্ছু নেই। "Pele is no more in football," পেলের দুগাল বেয়ে সেদিন ঝরেছিল অশ্রু ধারা। দু'হাতে মুখ ঢেকে বলেছিলেন—আমি আর কখনও ফুটবল খেলবো না।'

একজন সাংবাদিক তখন বলেছিলেন খুব কাছে এসে আন্তরিক গলায়—এভাবে আপনি বলবেন না, তাহলে গোটা ব্রেজিল দল দুর্বল হয়ে পড়বে। পেলে উত্তরে বলেছিলেন—'আপনারা ইল্যাংণ্ডে

প্রকাশিত পত্রিকাগুলো পড়েন নি, তারা পেলেকে দুর্বল বলে প্রমাণ করতে চেয়েছে।'

আপনি ফুটবলের বাদশা, আপনি ফুটবলের রাজা, ওই ইংরেজরাই ফলাও করে আবার না বলে—'The king never die'! কাজেই বুঝতে পারছেন, আপনি পেলে, এখনও পেলেই আছেন। ফুটবলের কাছে আপনি চিরকালের রাজা, চিরদিনের রাজা।

মুখ তুলে তাকিয়ে ছিলেন পেলে সেই সাংবাদিকের দিকে। ওঁর ঠোঁট জোড়া কাঁপছিল। এক বিশাল ব্যক্তিত্বময় মানুষকে সেই মুহূর্তে কি অসম্ভব করুণ বলে মনে হচ্ছিল। আড়ষ্ট গলায় পেলে বলেছিলেন—'জুলেরিমেকে ব্রেজিলের নিতেই হবে, আনতেই হবে ফরাসী সুন্দরী ললনা জুলেরিমেকে ব্রেজিলের খেলার আসরে, চিরকালের জন্য—চিরদিনের জন্য।

সেই আমি সেই আমি

সেই আমি, সেই আমি। সেই আমি পেলে। সেটা ছিল ১৯৪০ সালের ২৩শে অক্টোবর। ব্রেজিলের ছোট একটা শহর অঞ্চল টেসকেরাকোস। এই বাড়ির ছেলে এডসন-অ্যারেণ্টেস-ডু-নাসিমেন্টো। কত বড় নাম। এত বড় নাম কি কারো মনে থাকে। নিজেই অনেকদিন এই ছেলেটি তার বাড়ির লোককে বলেছে—বড় লোকের নাম এতবড় হয় না। আমি বড় নাম চাই না, আমার নামটা ছোট করে দাও। আমি ছোট নাম নিয়েই বড় হবো। দু'কথায় যাতে সবাই আমায় চিনতে পারে, বলতে পারে মুখে মুখে।

একথা তখন যিনি বলেছিলেন তখন তাঁর বয়স ছিল দশ বছর। সবে মাত্র পায়ে বল পড়েছে। মাঠের সবুজ ঘাস চিনতে শিখেছেন।

সবাই ওকে ভালোবাসত। ওর কথায় সেদিন ওর বয়ঃজ্যেষ্ঠরা

হেসেছিলেন। বলেছিলেন—ছেলেটা আর কিছু না হলেও কল্পনা-প্রবণ, বড় হবার সাধ রাখে মনে।

বড়—বড় কে না হতে চায়। সবাই চায়। আর এই ছোট বয়সে কে জানবে তার মধ্যে কি আছে না আছে। তাই আদর করে ওর নাম সংক্ষেপ করে কেউ ডাকতো 'ব্ল্যাকপার্ল' বলে, কেউ বা বলতো 'ব্ল্যাকসিজার,' কেউ ডাকতো 'ডিকো' নামে। বন্ধুরা ভালো-বেসে বলতো—সাসি। সাসি হচ্ছে একটা ভালোবাসার নাম।

—'ডিকো বেশ ফুটবল খেলে'। কথাটা একদিন বাবা বলেছিলেন।

অবাক হয়ে সেদিন তাকিয়েছিল ছোট ছেলেটি ওর বাবার দিকে, বলেছিলো—সত্যি, সত্যি আমার খেলা তোমার ভাল লাগে।

হাসতে হাসতে বাবা বললেন—সত্যি, তুমি খুব সুন্দর খেলছ।

—বাবার কথায় ওর বুকটা কেমন যেন করে উঠেছিল। ওর বাবাও ছিলেন একজন নাম করা ফুটবলার। বাবার কাছ থেকেই ডিকো শিখেছেন বল পায়ে মারতে। বাবা হাত ধরে তাকে নিয়ে গিয়েছেন খেলার মাঠে।

বয়স বাড়ল! বাড়লো খেলার প্রতি আগ্রহ, মমতা আর সাধনার একাগ্রতা।

হাত-বদল হলো শিক্ষার। বাবার কাছ ছেড়ে ডিকো এবার এসে পড়লেন বিট্টোর কাছে। চললো অনুশীলন, খেলোয়াড় হবার সাধনা চলতে লাগলো মনের মধ্যে।

বয়স এগিয়ে যায়। দশ বছরের ডিকোর চেহারা পালটালো, বয়স বেড়ে হলো ষোলো। ১৯৫৬ সালে ডিকো চললেন নিজের টেসকেরাকোস ছেড়ে ব্রেজিলের বিখ্যাত শহর স্যাণ্টোসে।

স্যাণ্টোস এক খেলার দেশ। এক নম্বর দল স্যাণ্টোসে নাম লেখালো ষোলো বছরের ছেলে। প্রথমেই সুযোগ পেলেন না সিনিয়ার দলে। নাম লিখিয়ে শুধু পেলেন নাম করা দলের হয়ে অনুশীলন করার টিকিট মাত্র। চললো শিক্ষার পর্ব।

আমি তখন ডিকো, আমি তখনও ফুটবলার হইনি। খেলিনি একটাও নামকরা দলের বিপক্ষে। টুকটাক এদিক ওদিক ছোটখাটো বেশ কিছু খেলা খেললাম কয়েক বছরে।

সুযোগ আসছিল না, তা বলে ধৈর্য হারালাম না।

১৯৫৭ সাল। আন্তর্জাতিক আসরে ফুটবলে পা ছুঁলেন পেলে সেই প্রথম। পরের বছর ডাক এলো আরো দূর পাল্লায়। পেলে যে কিছু ভাবতে পারছেন না। এ কি করে সম্ভব! তিনি ইউরোপ যাবেন ব্রেজিলের হয়ে। দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে। আনন্দে বুকটা উঠল দুলে। বুক জুড়ে শুরু হলো আবেগের ভূমিকম্প। চিঠি লিখতে বসলেন বাড়িতে।

ইউরোপ—কল্পনার রাজ্য। ফুটবল পায়ে নিয়ে ভেল্কি খেলা দেখাতে হবে। জেতাতে হবে ব্রেজিলকে, টিকে থাকতে হবে তাকে ফুটবলার হিসাবে, খেলতে হবে দেশের হয়ে আরো বড় খেলা।

ফুটবলের প্রেমিক, হয়ে উঠলেন আত্মহারা। বেতারের নব ঘুরিয়ে নিজের কানে শুনলেন ভায্যকারের কণ্ঠ নির্গত ব্রেজিল দলে মনোনীত নিজের নাম। নিজের নাম শুনতে কে না চায়, পেলেও চাইতেন। কোন এক আসরে বহুদিন বাদে ডিকো বলেছিলেন তার এক বন্ধুকে—'আমি আমার সবকিছু দিতে পারি কিন্তু পেলে নামটা কাউকে দিতে আমি রাজী নই।'

—কেন, তুমি কি তোমার নামটাকে খুব বেশী ভালোবাসো?

প্রশ্ন করেছিলেন বন্ধুটি।

তিনি বলেছিলেন—"ভাই, আমি ভালোবাসি ফুটবলকে। তবে ওই নামটাই আমায় অনেক সম্মান দিয়েছে। তাই ওটাকে ছাড়তে পারি না আমি, পেলে নামটাকে তাই আমি নিজেও শ্রদ্ধা করি।" পেলে নাম না মন্ত্র। গোটা শরীর জুড়ে ওই নাম শুনলে কাঁপুনি শুরু হয়। ওই নাম যে ফুটবলের বাদশার। ওই নামটা ঘিরে আছে এক অপার বিস্ময়। পিটার লরেঞ্জোর ভাষায়—"It is really

amazing yet Pele reminds as refreshingly unassuming as when he was discovered" ফুটবল আসরে গ্রামের সেদিনের এই ছেলেটির প্রতি বিস্ময় ঘোর কাটেনি বিশ্ববাসীর এখনও। পিটার লরেঞ্জো আপন উক্তি রাখতে গিয়ে বলেছেন বিনয়ের সুরে—'আমি জীবনে অনেক খেলা দেখেছি, দেখেছি অনেক বড়দরের খেলোয়াড়কে, কিন্তু তার মতন ফুটবলার দেখিনি কখনও, আর কেউ আছে বলেও আমার জানা নেই, শোনা নেই। বরং আশ্চর্যান্বিত হব, যদি আর কখনও কোনদিন এরকম ফুটবলার জন্মায়। লরেঞ্জোর নিজের ভাষায়—পেলের পায়ে আছে ফুটবলের যাদুমন্ত্র। যৌবনের মাদকতায় মিশ্রিত আছে লাস্যতার ছোঁয়া। কুমারীর চপলতার মতন তড়িৎ স্পন্দন ময়দানের বুকে ছুঁয়ে যায় পেলের একান্ত স্পর্শে। আমি অভিজ্ঞতায় বলতে পারি এমন খোলোয়াড় ফুটবল ইতিহাসে আর কখনও হয় নি এবং হওয়াও হয়ত সম্ভব নয়। পেলের খেলা দেখা ভাগ্যের এক দুরূহ পরীক্ষা। ওর খেলা না দেখলে জীবন আমার অতৃপ্ত থাকত।' হয়ত পুনর্জন্ম আমায় নিতে হতো পেলের খেলা দেখার জন্য। পেলেকে দেখে আমি গর্বিত, বিস্মিত, আমি আমার ভাগ্যকে তারিফ করছি।

পেলেকে মাঠের মানুষ দেখেছেন ঈশ্বরের মতন, ব্রেজিলের মানুষ ভেবেছে জাতীয় ঐশ্বর্যের মতন। ফুটবল ভেবেছে প্রেমিকের মতন, ফুটবলারেরা ভেবেছেন আদর্শের মতন, ন্যায়ের মতন, নীতির মতন। পেলে যা পারেন না, তা ফুটবলে পারা যায় না। পেলে যা খেলেন, তা হলো সত্যিকারের খেলা। বিশ বছর মাঠে খেলছেন সেই ছোট থেকে, ফাউল করেন নি কাউকে কোন দিনের জন্য। পেলের ভাষায়, কাউকে ফাউল করাটা হলো অন্যায়। ফুটবলের আইনবিরুদ্ধ। আমি আমার জন্য ফুটবল খেলি না, খেলি দলের জন্য, দেশের জন্য, দর্শকের জন্য। তবে খেলার সময় জাগিয়ে রাখি আমার মনের আনন্দকে। এই আনন্দেই আমি খেলি, খেলে আনন্দ পাই। ফুটবল তাই আমার কাছে আনন্দের খেলা, ভালোবাসার খেলা।

আমি বুঝি না, ওরা কেন আমায় নিয়ে এত আলোচনা করে। আমিও তো ওদের মতন, ওদের একজন মাত্র। সতীর্থদের দেখেছি আমায় ছুঁয়ে মাঠে নামতে, তরুণেরা আমায় প্রণাম করে, আমি বুঝে পাই না ওদের আমি কি বলবো। ওরা কি আমায় কোন পবিত্র দেবতার বিগ্রহ ঠাওরায়। আমি ফুটবলের বিগ্রহ নই, আমি খেলোয়াড়। আমি সেই আমি—আমার নাম ডিকো। আমার খেলার নাম পেলে।

জনৈক সুইডিস সাংবাদিক বিশ্বকাপ খেলা দেখে বেরিয়ে আসার পর আর একজনকে প্রশ্ন করেছিলেন—পেলে কে কি রকম দেখলেন ?

সেই সাংবাদিকটি বলেছিলেন—সূর্যের দিকে যেমন বেশীক্ষণ তাকানো যায় না, চোখ ধাঁধিয়ে যায়, পেলেও ঠিক তেমনি। ওর দিকে সারাক্ষণ একটানা নজর রাখা যায় না।

পৃথিবীর সব দেশের লোকেরা পেলের খেলার কৌশলকে আয়ত্ত করার জন্য টি, ভি, সেটে অনেকবার লক্ষ্য করার চেষ্টা করেছেন। কেউ কেউ তার খেলার কৌশলকে ছবি করে তুলে নিয়ে গেছেন, আবার কেউ পেলের খেলার কায়দাকে তুলিতে এঁকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন।

চেষ্টা করেছে ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া, ইতালি, ফ্রান্স। সবাই পেলেকে ভয় পায়, তাই তারা তাঁর ছবি তুলে খেলার কৌশলকে রপ্ত করতে চেয়েছিল। কিন্তু পেলে, পেলেই থেকে গেছেন। এক একদিন খেলেছেন এক এক নতুন পদ্ধতিতে, কৌশলে।

যার ফলে তাকে কেউ ধরে রাখতে পারে নি, একবার বল ধরেছেন এক রকম কায়দায়, অন্যবার সে বল আয়ত্তে নিয়েছেন ভিন্ন পদ্ধতিতে। একবার বল পায়ে নিয়ে তিনি যে পদ্ধতিতে দৌড়ান, পরের বারে তার দৌড়ের কৌশল হয় অন্য রকম। পেলের এই ভিন্ন গোছের, ঘন ঘন রূপ পালটানো খেলার জন্যই পৃথিবীর কোন দেশের ফুটবল বিশেষজ্ঞদের পক্ষে সম্ভব হয় নি, তার খেলার পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে নিতে। তারা পেলের

এক খেলা দেখে এক রকম অনুশীলনে রপ্ত হয়ে মাঠে নেমে খেলতে গিয়ে দেখেছেন, পেলে সেই অপ্রতিদ্বন্দ্বীই থেকে যাচ্ছেন। তাঁকে ধরা যায় না, বোঝা যায় না। আগের দিন যে নিয়মে খেলেছিলেন, পরের দিনের খেলার সাথে সেই নিয়মের হয়েছে অনেক তফাত।

তাই শেষ পর্যন্ত তাদের সমস্ত অনুশীলনগত শিক্ষা-দীক্ষা হয়েছে বানচাল। পেলে পেলেই থেকে গেছেন বরাবরের জন্য। কেউ তাঁকে ধরে রাখতে পারেন নি। পারবেন না।

কোন একজন বৃটিশ সাংবাদিক পেলেকে বলেছিলেন—আপনি কত রকম পদ্ধতিতে ফুটবল খেলেন ?

উত্তরে পেলে জবাব দিয়েছিলেন—তা-তো ঠিক বলতে পারবো না। তবে যে দিন যে রকম ভাবে ইচ্ছে হয় খেলতে, সে দিন সেই ভাবেই খেলি। এর জন্য সবাই মনে করেন আমি অনেক রকমের নিয়ম জানি। আসলে আমি ফুটবল খেলি ফুটবলের নিয়মে।

নিরাশ হয়ে সাংবাদিক কলম বন্ধ করে বলেছিলেন—আপনি পেলে, আপনার সব কিছু ভিন্ন রকম।

হাসতে হাসতে সাংবাদিক বন্ধুটির পিঠ চাপড়ে পেলে বলেছিলেন —আমি পেলে। সেই তোমাদের চিরকালের পেলে।

উত্তেজিত হয়ে সাংবাদিক বন্ধুটি বলেছিলেন—আপনি কে ?

হাসতে হাসতে জবাব এসেছিল পেলের কাছ থেকে—সেই আমি, সেই আমি।—তোমাদের চিরকালের ডিকো—পেলে।

পেলের পায়ে বল

পেলের পায়ে বল।

গোটা মাঠ জুড়ে তারস্বরে চিৎকার। আকাশ কাঁপিয়ে, বাতাস ভরিয়ে, সকলের কণ্ঠ থেকে নির্গত হচ্ছে তখন একটা নাম—পেলে—গো-অন্-পেলে।

পেলের পায়ে বল। সামনে তখন ছয়জন খেলোয়াড়। প্রথমে দুজন খেলোয়াড় ছুটে এলেন দু'পাশ থেকে। বল নিয়ে ছুটতে ছুটতে দাঁড়িয়ে পড়লেন পেলে। দুরন্ত ছেলের মতন তাকালেন এদিক ওদিক, ঠিক যেন বিষধর সাপের মতন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। গোটা শরীরটা ফুলে-ফেঁপে উঠছে।

বলটা পায়ের যাদুতে স্থির রেখে, হঠাৎ উদাস ভঙ্গিতে এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে দু এক পা। যেন কিছুই হয় নি। কিংবা ভাব দেখে মনে হচ্ছিলো তিনি কারো সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কথা বলতে যাচ্ছেন। পেলের ভাব দেখে বিপক্ষের দুজন খেলোয়াড় তো অবাক। তারা এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলেন বলটা খোঁজার জন্য, সেই সুযোগে একটু ফাঁক বুঝে পেলে দ্রুত বলটা ঠেলে দিলেন ওদের ফাঁক দিয়ে, তারপর দিলেন বল ধরেই লম্বা ছুট। আর কে ধরবে তাঁকে। আবার একজন—তাকে অনায়াসে কাটিয়ে পেলে দাঁড়ালেন শেষ ডিফেন্সের মুখোমুখি। রানিং বলকে পায়ের চেটো দিয়ে তুলে নিয়ে, হাঁটুর সাহায্যে বলটা নিলেন মাথার ওপর। তারপর করলেন ব্যাক হেড। অতঃপর ডান পায়ের হিল দিয়ে বলটা আবার সামনে তুলে নিয়ে করলেন বাঁ পায়ের জোরালো শট, মুহূর্তে বলটা জড়িয়ে গেল জালে।

গোটা মাঠ ভরে গেল করতালিতে। বল পায়ে নিয়ে গোল করা পর্যন্ত তার সময় লেগেছিল মাত্র ৩০ সেকেণ্ড। আর এই ৩০ সেকেণ্ডের মধ্যেই করলেন তিনি বলকে কত না কাণ্ড। এই গোল সম্পর্কে উপস্থিত এক সাংবাদিক বলেছেন—'He scored like a Magician, ultimate the Score was in Circus style.' সত্যি—যাদুর মতন গোল। এ যেন মায়ার মাধুরী। গোটা মাঠ তখন স্তব্ধ।

গোল দিয়ে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ফিরে এলেন পেলে। মারকানা স্টেডিয়াম সার্থক। ফুটবলের এক যাদুঘর এই মারাকানা। পেলের এই গোল তাঁর খেলোয়াড় জীবনে আনল এক রেকর্ডের মুখোমুখি।

খেলার আগে ছিল ৯৯৮টি গোল আর এই গোল দিয়ে হলো ৯৯৯টি গোল। আর একটি—আর একটি হলেই পূর্ণ হবে এক হাজার গোল।

ক্রিকেটের কাছে একটি রান, মাঝে মাঝে অসহ্য করে তোলে ক্রিকেটকে। তবু বড় দরকারি এই একটি রান, এই রানটি না হলে শত রান পূরণ হয় না ব্যাটসমানের। আর এই একটি রান করতে গিয়ে অনেক আচ্ছা দরের ব্যাটসম্যানকেও হঠতে হয়েছে পিছ পা। এ তো ক্রিকেট নয়, এ হলো ফুটবল। গোলের স্থিরতা রানের চাইতেও অনেক সময় অনিশ্চিত।

সেদিন মারাকানার প্রতিটি দর্শক চাইছিল পেলের আর একটি গোল দেখতে। দু' চোখ জুড়ে সাক্ষী হয়ে থাকবে পেলের মন মাতানো হাজার গোলের। বিশ্ব ফুটবলের একটি অন্যতম রেকর্ড। একটা গোল করতেই দম বেরিয়ে যায়, এতো হলো হাজার গোল। লোকটা কি মানুষ। প্রত্যেকের অধীরতা। মারাকানা জুড়ে এক অধীর উৎকণ্ঠার প্রতীক্ষা। রাজার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তির জন্য এই প্রতীক্ষার পালা।

আর একটা গোল হলেই হাজার গোল পূরণ হবে। বিশ্ব ফুটবলে গড়ে উঠবে এক খেলোয়াড়ের অসামান্য অবদানের আর শ্রেষ্ঠত্বের রেকর্ড।

কেউ বললে—ছেড়ে দাও ওকে গোল করতে, আমরা চাই আজি হয়ে থাক সেই স্মরণীয় খেলা।

পেলে, তুমি বঞ্চিত করো না আমাদের! তুমি গোল কর। ভাস্কো-দা-গামা ক্লাবের খেলোয়াড়েরা সবাই ঘিরে ধরলেন পেলেকে।

গোটা মারাকানা জুড়ে প্রার্থনা। প্রথম গোল হয়েছে সার্কাস খেলার মতন চকিতে। অথচ এই গোলের মধ্যে পেলে করেছেন কতই না কারিকুরি।

মাত্র বারো মিনিট সময় পার হয়েছে। হঠাৎ পেলে দৌড় শুরু করলেন মাঠের কোনাকুনি। টাচ লাইন থেকে চিলের মতন ছোঁ মেরে বলটা আটকে নিলেন পায়ের সঙ্গে, তারপর লাইন বরাবর শুরু করলেন ছুটতে।

পেলের পায়ে বল।

গোটা মারাকানা উদ্বেল! উৎকণ্ঠিত হাজার হাজার মানুষ!

বল নিয়ে কালো ছেলে পেলে ঢুকে পড়লেন পেন্যালটি সীমানায়। চকিতে ঘটে গেল এক কাণ্ড। বিপক্ষের একজন ব্যাক মরিয়া হয়ে ফাউল করলেন পেলেকে! সঙ্গে সঙ্গে বাঁশি বাজালেন রেফারি।

মারাকানা ছাপিয়ে বাজালো সেই বাঁশির শব্দ।

ফাউল—ফাউল করেছে পেলেকে।

পেন্যালটি দিলেন রেফারি।

বল বসানো হ'ল। এখন প্রশ্ন কে মারবে এই পেন্যালটি। সবাই ছেঁকে ধরল পেলেকে। বললো—আপনি মারুন।

—উঁ হুঃ, অসম্ভব পেন্যালটিতে গোল করা আমি পছন্দ করি না!

হাজার হাজার দর্শক চেঁচিয়ে উঠলো।

—কোন কথা নয়, আপনাকে মারতেই হবে। We want to see a great record of a great footballer.

আমরা সবাই সাক্ষী হতে চাই! হাজার গোলের রাজসাক্ষী। স্যান্টোসের সবাই এসে ধরল পেলেকে। পেলে তবু নারাজ। বললেন—অন্য কেউ এই গোল কর। আমি এর পরের গোলটা করবো।

না। কোন কথা শুনবো না। আমরা এক্ষুণি চাই আপনার হাজার গোলের রেকর্ড দেখতে!

শেষে এগিয়ে এলেন রেফারি। বললেন—মিঃ পেলে, আমারও ইচ্ছে পেন্যালটি শট্টা আপনি করুন। আপনার হাজার গোলের সঙ্গে দর্শকরা বেঁচে থাকতে চায়। শুধু আমার দিকে তাকিয়ে এই অনুরোধটুকু আপনি রাখুন।

অনুরোধ। অনুরোধ রক্ষায় মানুষকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও করতে হয় অনেক কিছু। Adjustment বলে একটা শব্দ আছে না ইংরাজীতে। শেষ পর্যন্ত সকলের নাছোড়বান্দা চাহিদার মুখোমুখী হয়ে পেলে এগিয়ে গেলেন পেন্যালটি শট করতে।

বল বসানো হলো। বাঁশি বাজলো। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বাঁ পায়ের সাহায্যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও শট করলেন পেলে। আগুনের গোলার মতন তীব্রতায় বল জড়ালো জালে।

হাজার গোল। তৃপ্ত হলো হাজার হাজার মানুষ। সার্থক হলো মারাকানা স্টেডিয়াম। পেলের হাজার গোল হবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো জাতীয় সংগীত। ইথার তরঙ্গে ঘোষিত হলো পৃথিবীর ফুটবলের এই আশ্চর্য সংবাদ।

সবাই এসে জড়িয়ে ধরলেন পেলেকে। আবেগে গোটা শরীর ওর কেঁপে উঠল। কালো পুরু ঠোঁট জোড়া কাঁপতে থাকলো।

একি কি দেখছেন তিনি, সবাই এসে বিগ্রহের মতন তাকে পরম পবিত্রতায় ছুঁয়ে যাচ্ছে। চোখ বেয়ে সেদিন তাঁর জল নেমে এসেছিল, এ যে আনন্দাশ্রু। একি তিনি দেখছেন,—এত পেয়েছেন তিনি একজন খেলোয়াড় হয়ে। খেলোয়াড় তো তার মতো অনেকেই আছেন।

চারিদিকের অভিনন্দন, আর করতালির মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ ডুবে গেলেন পেলে।

স্যাণ্টোসের অধিনায়ক এগিয়ে এসে নিজের জার্সি দিয়ে পেলের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে ডাকলেন, অনেকদিনকার এক পুরনো নামে। বাবা তাকে এই নামে ডাকতেন,—ডিকো, একি তুমি কাঁদছ!

চমকে উঠলেন পেলে।

জড়িয়ে ধরলেন অধিনায়ককে। আবেগে বললেন—আর একবার, আর একবার তুমি আমায় ডিকো বলে ডাক।

খেলা শেষ হলো।

অভিনন্দন এলো ব্রেজিলের রাজপ্রাসাদ থেকে। গোটা ব্রেজিল শহর সেদিন আত্মহারা। আনন্দে অবিভূত হয়ে বিশ্ব ফুটবল সংস্থা ফিফার প্রেসিডেন্ট স্যার স্ট্যানলী রাউস পাঠালেন তারবার্তা। তিনি বললেন—'The whole football world will applaud the remarkable achivement by Eydson Arantes Nescimant

(Pale) in scoring 1000 goals in international and other representative and club football matches.

This wonderful performence may not be superseed by any other player for many years and all who have seen his play will wish to join with me in offering sincere congratulation.

ঘড়িতে তখন অনেক রাত।

চোখে ঘুম নেই পেলের। একটু আগে প্রাণের প্রিয়া রোজি মেরী চোখ বুজিয়েছে।

ওর নীল চোখ জুড়ে আজ ঝরছে অনেক স্বপ্নের মাদকতা। পরম তৃপ্তিতে এখন চোখ বুজিয়েছে সেই স্বপ্নের মেরী।

টেলিগ্রাম হাতে এলো ঠিক সেই সময়। স্যার স্ট্যানলি রাউসের বিজয়বার্তা। ঘরের নীলাভ আলোয়, হাতে বিজয়বার্তা পত্রটি ধরে জানলার সামনে তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন পেলে। অনেকক্ষণ—অনেকক্ষণ।

চোখ জুড়ে আজ ওর অনেক স্মৃতি। বুক জুড়ে অনেক কথা। জানলার বাইরে তখন চুপচাপ একটা রাত গভীরতায় ডুবছে। শান্ত শহর। পেলের চোখে ঘুম নেই। ওর আজ মনে পড়ছে বাবার কথা, মার কথা, আর সেইসব ছোটবেলাকার সঙ্গীদের কথা, যাদের সঙ্গে ফুটবলের রাজা প্রথম দিয়েছিলেন পায়ে বল, যারা তাকে ডাকতো আদরের গলায় 'সাসি' বলে, বাবা ডাকতেন—'ডিকো'!

সত্তর দশক মুক্তির দশক

সত্তর দশক, মুক্তির দশক।

জুলেরিমের আসর বসলো মেক্সিকোয়। বিশ্ব ফুটবলের এক

জমকালো আসর ঘর। ফুটবলের মহড়া শুরু হলো দিকে দিকে। চললো বিশ্বের সব দেশে জোরদার দল গঠনের পালা।

সত্তরের জুলেরিমে কার ঘরে আসবে। কে পাবে এবারের জুলেরিমেকে। ১৯৬৬ সালে ইংল্যাণ্ড নিজের দেশে জুলেরিমেকে পেয়ে অনেক শয়তানি করেছে। মারধোর করে মাঠ থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য করেছে ব্রেজিলের পেলেকে।

রাগে, দুঃখে, অপমানে পেলে বলছেন—আর আমি জুলেরিমেতে খেলবো না। এখনকার ফুটবলে এসেছে এক সর্বনাশের দিন, ফাউলের খেলা। আমি খেলবো না, খেলবো না—কিছুতেই খেলবো না।

গোটা সত্তর দশক জুড়ে তাই সকলের মনে প্রশ্ন ছিল, পেলে কি খেলবেন, আসবেন কি আবার যাদুকর নতুন বিদ্যা রপ্ত করে ফুটবলের যাদুঘরে পা ছোঁয়াতে?

ব্রেজিল আসছে। নতুন দল নিয়ে। পেলে আসছেন না, কেউ বা বললেন—গুপ্ত খবর, পেলে আসছেন, খুব জোরজার করে তাকে রাজি করানো হয়েছে।

কাগজে লেখালেখি হলো। লেখা হলো ব্রেজিলকে সন্তুষ্ট করার জন্য ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যৎকিঞ্চিত দোষারোপ। পেলে এলেন। জোর করে শেষ পর্যন্ত তাকে রাজি করানো হলো মেক্সিকোয় আসতে।

সত্তরের জুলেরিমে অনুষ্ঠিত হবার আগেই বিশ্ব ফুটবল জানালো, আমরা পেলেকে যাদুকর হিসাবে গণ্য করেছি। বিশ্বের প্রতিটি দেশের ৮০ জন সাংবাদিকের একটি কমিটি ১৯৫০ থেকে যে সব ফুটবল খেলোয়াড় খেলেছেন, তাঁদের সেরাকে নির্বাচন করলেন তাঁরা। এর মধ্যে পেলেন পেলে ৭০টি ভোট। রাশিয়ার গোলরক্ষক লেভ ইয়াসিন পেলেন ৬৯টি ভোট। এক ভোটে জিতে গেলেন পেলে। দীর্ঘদিন পর বিশ্ব ফুটবল থেকে জানানো হলো—সাওয়াল শেষ—পেলে হয়েছেন প্রথম। তিনি বিশ্বের সেরা ফুটবলার।

খুশী হলো বিশ্বের ফুটবল প্রিয় মানুষ। চিৎকার করে তার মধ্যে

অনেকে বললেন ইংল্যাণ্ডকে—কোথায় গেল তোমাদের ইউসোবিও? Pale is dead বলেছিলে না তোমরা! আসলে পেলে রাজা, রাজা কখনো মরে না। তাই পেলেও মরতে পারেন না।

ইউসোবিও অবশ্য ৬৬ সালে বলেছিলেন—ওঁরা অনর্থক আমায় সেরা প্লেয়ার বলছেন। পেলের সম্মান চিরকালের, আমি তার কাছে একজন গোলাম বিশেষ, অনেক কিছু শেখার আছে পেলের কাছে। পেলের কাছে আমি একজন কনিষ্ঠ ফুটবলার মাত্র।

সত্তর দশক পেলের সৌভাগ্যের আর এক সূচক বছর। ব্রেজিল চললো জুলেরিমে খেলতে।

আমার চাই জুলেরিমে

বিমান বন্দরে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার মানুষ। ব্রেজিল চলেছে জুলেরিমে খেলতে। দলে আছেন বিশ্বের সেরা ফুটবলার পেলে।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে সবাই বিমানে উঠলেন একে একে। পেলেকে বিদায় দিতে এসেছেন রোজি। বাদামি রঙের চুল, নীল চোখ, পরনে সবুজ স্কার্ট।

পেলে দাঁড়ালেন রোজির মুখোমুখি, কয়েক মাসের জন্য রোজিকে ছেড়ে থাকতে হবে।

রোজির নীল চোখ জুড়ে নেমেছে সমুদ্রের ছায়া। পেলে বললেন —চোখের জল ফেলো না রোজি।

রোজি বললেন পেলের দিকে তাকিয়ে—আমি কি চাই জিজ্ঞাসা করলে না তো, আমার জন্য এবার তুমি কি আনবে?

—কি আনবো তুমি বল? কি চাই তোমার রোজি?

কান্না ধরা ভেজা গলায় রোজি বললেন—আমার জন্য জুলেরিমে আনবে। আমি জুলেরিমেকে চাই, চায় গোটা ব্রেজিলের মানুষ।

আবেগ মিশ্রিত গলায় পেলে বললেন—তাই হবে। আমি আনবো—জুলেরিমে তোমার জন্য, আমার ব্রেজিলের জন্য জুলেরিমেকে আমায় আনতেই হবে।

ব্রেজিলের বন্দর থেকে বিমান উড়লো মেক্সিকোর পথে। বিশ্বের সেরা ফুটবল সুন্দরী জুলেরিমেকে আনতে। জুলেরিমে আনতে পাড়ি দিলেন ব্রেজিলের কালো রাজা পেলে।

জুলেরিমে তুমি কার

—জুলেরিমে তুমি কার ?

—যে আমায় চায় আমি তার।

—তুমি আমার হবে ?

—আমাকে তোমায় পেতে হলে, একবার নয়—দুবার নয় বার-বার—তিনবার পেতে হবে।

তিনবার যে পাবে জুলেরিমেকে, সে হবে তারি। গোটা বিশ্ব ফুটবল জুড়ে তখন চলেছে এক টানাটানি হানাহানির পালা। সবাই চায় জুলেরিমেকে। চাওয়াটা তো অপরাধ নয়, বিশ্বের সেরা সুন্দরীকে তো সবাই পেতে চায় নিজের দখলে।

সুন্দরী জুলেরিমে। মায়াবী জুলেরিমে। কামনার জুলেরিমে। ফরাসী সুন্দরী ললনা জুলেরিমে।

উরুগুয়ে, ইতালী, ব্রেজিল—এরা সবাই দুবার করে পেয়েছে জুলেকে। তাই এই তিনজনের মধ্যেই প্রধানত শত্রুতা। এরা তিন-পুরুষ। এরা তিনজন পরস্পরকে সন্দেহ করে। এই তিন পুরুষের দুর্বার কামনার আকর্ষণ জুলেরিমের চোখ জুড়ে। জুলেরিমে সব বোঝে, সে হাসে, দুষ্টু চোখে তাকায়। প্রশ্ন করলে বলে—কি করে বলবো, আমি কার হবো।

—তুমি কাকে ভালোবাসো।

—সবাইকে। যে আমায় ভালোবাসে সেই আমার ভালোবাসার, যে আমায় পাবে আমি তাকেই ভালোবাসবো। তবু সে মন খুলে কিছু বলে না। কেবল বাঁকাচোখে মায়াবী ঈশারায় ডাক দেয় প্রত্যেককে।

সুন্দরী জুলেরিমেকে ঘিরে সেদিন শুরু হলো ফুটবলের দাপট। শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলো পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ।

গতবছরের নাম করা দল ইউসোবিওর পোর্তুগাল, এবছর ধোপে টিকলো না, দাঁত ফোটাতে পারল না ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া, উরুগুয়ে, জার্মানীর মতন বাঘা বাঘা টিম। গত বছর নিজের মাঠে পেয়ে খুব একহাত মস্তানী করেছিল ইংল্যাণ্ড। জোর করে ঘিরে ধরে মেরেছিল ফুটবলের বাদশা পেলেকে, একলা পেয়ে ইংল্যাণ্ডের রেফারী দিয়ে হারানো হয়েছিল ব্রেজিলকে। এবারতো আর জুলেরিমের অনুষ্ঠান ইংল্যাণ্ডে নয়, এবারে আসর বসেছে রূপসী মেক্সিকোতে। একে একে সরে গেল সব বাধা।

পেলে এগিয়ে গেলেন ব্রেজিলের জামা গায়ে দিয়ে। ফুটবল, আমি তোমায় ভালোবাসি। আমি ফুটবলের রাজা, আমি পেলে। ফুটবল, আমি নতজানু হয়ে তোমার কাছে সুন্দরী ফরাসী ললনা জুলেরিমেকে চিরদিনের জন্য কাছে পাবার প্রত্যাশায় প্রার্থনা করছি। জুলেরিমেকে, আমি ফুটবলের ভালোবাসায় নিয়ে যেতে এসেছি ব্রেজিলে। আমি কথা দিয়েছি আমার প্রাণপ্রিয়া হৃদয়সঙ্গিনী—রোজিমেরীকে। জুলেরিমেকে আমার চাই, ওকে আমি তুলে দেব ব্রেজিলের হাতে, ব্রেজিল ললনা আমার সুন্দরী রোজিমেরীর হাতে।

মেক্সিকোর আসরে একদিকে ফাইনালে উঠল ইতালী, অন্যদিকে ব্রেজিল। দুই দলই এবার তৈরী। ওরা দুজনেই জুলেরিমেকে পেয়েছে দুবার করে। পেতে হবে তিনবার—যে পাবে তিনবার, জুলেরিমে হবে চিরকালের জন্য তার। দুই দলেই তাই কড়াকড়ি সাজাসাজির বহর হলো শুরু।

ফাইনাল খেলবে ইতালী আর ব্রেজিল। দুই পাশে দুই পুরুষ

মাঝখানে মালা হাতে দাঁড়িয়ে জুলেরিমে। যে জিতবে প্রতিযোগিতার আসরে, তারই গলায় মালা দিয়ে চিরকালের জন্য তারি সঙ্গে চলে যাবে জুলেরিমে। ফুটবলের প্রাণপ্রিয়া কন্যা জুলেরিমের বিদায় মুহূর্ত উপস্থিত। গোটা বিশ্ব জুড়ে তখন এক বুক চাপা উৎকণ্ঠা। সকলের মনে এক প্রশ্ন কে পাবে, কার গলায় শেষ পর্যন্ত মালা দিয়ে তার হয়ে যাবে জুলেরিমে। আঁকা চোখে জুলেরিমের বাঁকা হাসি, কথা বলে না শুধু বলে, যে আমায় সত্যিকার ভালোবাসে সেই জিতবে। সেই আমায় পাবে।

ভালোবাসার লড়াই, প্রেমের লড়াই শুরু হলো জুলেরিমেকে ঘিরে ২১শে জুন তারিখে। ইতালী হারিয়েছে দুর্ধর্ষ জার্মানকে, তবে কি ইতালীই পাবে, পরক্ষণেই আবার ভেসে উঠেছে ব্রেজিলের কালো রাজার কথা, পেলে ফুটবলের বাদশা।

বাঁশী বাজল।

শুরু হলো লড়াই। কেউ কারো থেকে কমতি নয়।

বল একবার এদিক থেকে ও গোলে যায়, আবার তা পরক্ষণে ফিরে আসে এ গোলে। কেউ কাউকে ছাড়বে না। জুলেরিমেকে ভালোবাসে ওরা দুজনেই।

ভালোবাসার লড়াই জোরদার হয়ে ওঠে। মাত্র খেলা হয়েছে তখন ১৮ মিনিট। কালো রাজা পেলে তখনও একটা বল ছুঁতে পারেন নি। তাকে ঘিরে আছে ইতালীর তিন তিন জন খেলোয়াড়। পেলেকে যে করেই হোক আটকাতে হবে। এক সময় উঁচু করে একটা বল সেন্টার করলেন ব্রেজিলের একজন ফরোয়ার্ড, পেলে দৌড়লেন। পিছনে ওরা ছুটে আসছে—একজন, দুজন, তিনজন। গোল থেকে পেলের দূরত্ব তখন ৩৬ গজের মধ্যে।

কি যেন একবার ভাবলেন পেলে নিজের মনে। চকিতে কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে সেণ্টার করা বলের লাইন লক্ষ্য করে ছুটে গিয়ে লাফিয়ে উঠে বলটা ছুঁয়ে দিলেন পেলে তার ভালোবাসার কপালে। কপালের কি অসম্ভব জোর, হেড করা বলটা গোলার মতন ৩৫ গজ দূর থেকে ঢুকে গেল বার ঘেঁষে জালের মধ্যে।

গোল—গোল—গোল। গোটা মাঠ ডুবে গেল চিৎকারে।

কলকাতার বুকে রাতজাগা অসংখ্য মানুষ, যারা সেদিন যে যার ঘরে রেডিওর সামনে ঝুঁকে ছিলেন এতক্ষণ তারাও চিৎকার করে উঠলেন—গোল—গোল। Pale is the scorer, শুধু এইটুকু—পেলে। ব্যস, শুধু এই নামটুকু আর কিছু জানার দরকার নেই।

প্রথম গোল হলো। ব্রেজিল জিতছে, যেন নিজের দেশের কেউ গোল করছে—চোখের মণি। তবু ছাড়লো না ইতালী। একটা তো গোল তাতে হয়েছে কি, এর নাম ফুটবল। গোল শোধ দিল ইতালী। কিন্তু—শেষ পর্যন্ত পারলো না ভালোবাসায় তারা জুলেরিমেকে টিকিয়ে রাখতে। ৪-১ গোলে ম্যাচ জিতে গেল ব্রেজিল। গোটা মাঠ চিৎকারে ডুবে গেল।

খেলা শেষ হলো।

গোটা মাঠ জুড়ে তখন এক আনন্দ প্রবাহ। পেলে! পেলে!—কোথায় পেলে! ৩৫ গজ দূর থেকে হেডে গোল—উঃ এতো ভাবাই যায় না। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাংবাদিকরা তখন মাছির মতন ভনভন করতে লাগলেন তার চারপাশে। ক্যামেরাম্যানেরা নাছোড়বান্দা।

ঘন ঘন উঠছে ছবি। হাসছেন পেলে, কথা বলছেন পেলে, খেলার শেষে জুতো খুলছেন, জামা খুলছেন, প্যান্ট বদলাচ্ছেন। অধৈর্য হয়ে উঠে মানুষটা, একটু দম ফেলতে দিচ্ছে না তাকে কেউ? একের পর এক তারবার্তা এসে পৌঁছয় হাতে। অপেক্ষা করে থাকলেন—পেলে একটি মুহূর্তের জন্য। কখন সে আসবে, কখন শুনবেন সেই সুমধুর কণ্ঠস্বর—আমি খুশী, সবচাইতে খুশী।

দূর ব্রেজিলের ইথার তরঙ্গে এক সময় ভেসে এলো সেই কণ্ঠস্বর—হ্যালো, আমি রোজি বলছি!

—আমি পেলে বলছি?—তুমি?

—আমি আজ সব চাইতে খুশী। ভীষণ আনন্দ হচ্ছে আমার, তোমাকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে, তোমাকে আদর করতে ইচ্ছে করছে।

—আমারো—আমারো রোজি, এই মুহূর্তে তোমাকে চাইছি কাছে পেতে। অনেক কাছে, ভীষণ কাছে।

সেদিন রিও শহরে

সেদিন রিও শহর ঘিরে এক অভূতপূর্ব চঞ্চলতা। মানুষের মনে এক সুগভীর অস্থিরতা। সকাল থেকে গোটা শহরের চারদিক ঘিরে জমতে শুরু করেছে মানুষ। মানুষ আর মানুষ। দূর পাল্লা থেকে অনেকে চলে এসেছেন শহরে। পথের দুধারে মানুষ। গোটা বিমান বন্দর থৈ থৈ করছে মানুষে। এত মানুষ, এত মানুষ এসেছে কি দেখতে! এসেছে ব্রেজিলের জন্য আনা তাদের চিরকালের জুলেরিমেকে দেখতে। আজ জুলেরিমে আসছে। আসছে বিমানে চেপে, সঙ্গে আছেন ফুটবলের রাজা পেলে। The king of Football. জুলেরিমের সঙ্গে পেলে। পেলের হাতে জুলেরিমেকে সবাই দেখতে চায়।

আজ আর পুলিস নয়। চারদিকে রাখা হয়েছে মিলিটারি। এত মানুষের উত্তেজনা ঠেকানো সম্ভব হবে কি করে।

এসেছেন ব্রেজিলের প্রেসিডেণ্ট। উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র আজ সব একাকার। আজ সবাই এসেছে যে যার পোশাকে জুলেরিমেকে অভিবাদন জানাতে।

হাজার হাজার মানুষের কোটি কোটি দৃষ্টি তখন আকাশে ছড়ানো। নীল আকাশ জুড়ে মানুষের প্রতীক্ষার চাউনি। পক্ষীরাজের তো কোন চিহ্ন নেই। তাহলে কোথায় গেল। মেক্সিকো থেকে খবর এসেছে প্লেন ইতিমধ্যে ফ্লাই করে গেছে। এত দেরি হচ্ছে কেন তাহলে। এত দেরিতো সহ্য হচ্ছে না। আর কত দেরি?

এক সময় সার্চ প্লেন খবর আনলো, এসে পড়েছে, ঢুকে পড়েছে বিমানটি ব্রেজিলের সীমানায়, জুলেরিমেকে নিয়ে।

উল্লাস? মাতোয়ারা হয়ে আছে মানুষ। দূর থেকে শোনা গেল পপলারের শব্দ। কড় কড় করে বাজছে। ওই—ওই যে আসছে। গতি কমছে। বিশ্বজয় করে ফিরে এলো ফুটবলের একটা গোটা দল। দল তো নয়, যেন একটা গোটা জাতি। ফুটবলের মধ্যেই আজ জাতীয়তার প্রতিফলন।

উল্লাস, চিৎকার। কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ গেল ডুবে। কেউ কারো কথা শুনতে পেল না। শুধু দুটি নাম আকাশ বাতাস তখন মুখরিত।

—"জুলেরিমে,"—"পেলে"।

বিমানের দরজা খুললো। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন সর্বপ্রথম জুলেরিমে হাতে ব্রেজিলের অধিনায়ক।

জনতার থেকে আবেদন উঠল—আমরা জুলেরিমেকে দেখতে চাই—ফুটবলের রাজা পেলের হাতে। ফুটবলের রাজার হাতে ফুটবল সুন্দরী জুলেরিমে যেন এক ঝলক লাজুক ভঙ্গিতে হাসলো।

গোটা বিমান বন্দর ভরে গেল উল্লসিত কণ্ঠস্বরে।

বিমানের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন বিশ্বজয়ী ব্রেজিলদলের নায়কেরা। মাটিতে কারো পা ছুঁলো না। হাজার হাজার মানুষের কাঁধ ছুঁয়ে তখন বিশ্বজয়ী এগারো জনের লুটোপুটি।

এ যেন এক বিপ্লব। এ যেন এক পাগলা ঝোরার নৃত্য। গায়ের কাপড় জামা কারো ঠিক থাকলো না। ছিঁড়ে গেল আনন্দের অভিনন্দনে টুকরো টুকরো হয়ে। সবাই বিবস্ত্র। বিবস্ত্র এগারোজন ফুটবলার। বিবস্ত্র ফুটবলের কালো রাজা পেলে। লজ্জা নেই, আনন্দের প্রকাশে আবার লজ্জা কিসের—রাজপথের উজ্জ্বল আলোয় মানুষের কাঁধে চড়ে এগিয়ে চললেন—ফুটবলের রাজা।

ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসে পেলে

কলকাতার কোন এক রাস্তায়, ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাস থেকে বাজারের থলি হাতে নিয়ে নামলেন পেলে। ঠিক সেই মুহূর্তে ধরুন আপনি বা আমি হাঁটছি, পাশে ভনটুদার দশ বছরের ছেলে খোকন।

বললাম খোকনকে,—চিনতে পারিস ওকে ?

—কাকে কাকামণি।

—ওই যে বাজারের ব্যাগ হাতে নিয়ে হাঁটছেন, ট্রাম থেকে নামলেন।

—উঁহুঃ,—

—উনি হলেন পেলে—

—বল কি ! সত্যি ! সে আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালো না।

সোজা আমার পাশ থেকে ছুটে গেল খোকন, পেলেকে দেখতে।

বিশ্বাস হচ্ছে না তো, পেলে নামছেন কিনা কলকাতার রাস্তায় সেকেণ্ড ক্লাস ট্রাম থেকে ! তিনি হলেন ব্রেজিলের চোখের মণি। এর নাম কলকাতা, ঘটে যায় এখানে কত হরেক ঘটনা। কলকাতার রাস্তায় সেদিন এমনি এক ঘটনা ঘটেছিল আমার। তবে তিনি পেলে না হয়ে অন্য কেউ ছিলেন, যাকে ঘিরে একদা আমাদের কলকাতার ফুটবলে চলেছিল কাড়াকাড়ি, ধস্তাধস্তির পালা। অনায়াসে তাকে আমি পেলে বলতে পারি আমাদের খেলার আসরে। তবে তিনি আমাদের পেলে, ব্রেজিলের নয়, তাই তাঁকে নামতে দেখেছিলাম সেদিন সেকেণ্ড ক্লাস ট্রাম থেকে বাজারের থলি হাতে নিয়ে।

খোকন ঘুরে এসে বলেছিল, কাকামণি, ভাবতে পারো উনি যদি পেলে হতেন, তাহলে—

হেসে বলেছিলাম—খোকন, পেলের পরম সৌভাগ্য উনি আমাদের দেশে জন্মান নি। যদি পেলে আমাদের দেশের ফুটবলার

হতেন তাহলে এই হাল-আমলের কলকাতায় তাঁকেও এই অবস্থায় দেখতে পেতাম নির্ঘাত। পেলের পরম সৌভাগ্য, আর ফুটবলের অশেষ করুণায়, তিনি জন্মেছেন ব্রেজিলে। তাই তিনি খেলছেন ফুটবল মনের সুখে। আপন আনন্দে। ফুটবলকে তাই তিনি দিতে পেরেছেন অনেক কিছু. ফুটবল তাকে বসিয়েছে রাজার আসনে। পেলে তাই বাদশা,—ফুটবলের রাজার রাজা।

যদি তিনি দৈবাৎ জন্মাতেন বাংলাদেশে, বাঙালী হয়ে, তাহলে তিনি, সেই মহাশয় পেলে বাবা মার চোখে হতেন ছোটবেলায় বকাটে ছেলে। খেতেন মারধোর। খেলার জোরে হয়তো জুটতো তার একটা ব্যাঙ্কের চাকরি, কিংবা হতেন কেরানী। পরিণত বয়সে ফুটবল থেকে বিদায় নেবার পর দেখা যেত ঠিক এইভাবে বাঙালী ফুটবলারের মতো ট্রামের সেকেণ্ডে ক্লাস থেকে বাজারের থলি হাতে নিয়ে নামতে। কিংবা নিদেনপক্ষে হলেও তা হতো হয়তো ফার্স্ট ক্লাস। আর যদি ভাগ্য হত প্রসন্ন, তবে পেতেন তিনি অর্জুন পুরস্কার অথবা বর্তমানের একটা দায়সারা পদ্মশ্রীর মতো সরকারী পদক।

পেলে তুমি ভাগ্যবান—তুমি কলকাতায় তথা ভারতের ফুটবলার হওনি। তাহলে ঘরকুণো হয়ে পড়ে থাকতে হতো তোমায়। মারডেকা পর্যন্ত হতো তোমার আন্তর্জাতিক খেলার সীমানা। তুমি পেলে হয়ে পেল হয়ে যেতে। হতে পারতে না ফুটবলের বাদশা।

শোনা যায় ব্রেজিলের রাজপথ ধরে হাঁটতে গিয়ে বড় একটা রাজপ্রাসাদের মতো বাড়ির দিকে তাকিয়ে একজন বিদেশী যুবক নাকি প্রশ্ন করেছিলেন—এটি কার বাড়ি, এখানে রাজপরিবারের কেউ কি থাকেন ?

কথাটা শুনেছিল একটি ছোট হকার ছেলে। ভ্রূকুটি তুলে সে এগিয়ে এসে বলেছিল—আপনি কতদিন এসেছেন এখানে ?

—মাত্র কয়েক দিন।

—আরে রামো ছোঃ—আপনি ব্রেজিলে একদিনের ওপরে থাকলেন, অথচ এই বাড়িটি কার জানেন না।

থতমত হয়ে গিয়েছিল বিদেশী যুবকটি। হকার ছেলেটি চড়া গলায় বললো—একথা যা আমায় বলেছেন বলেছেন, আর কখনও কাউকে বলবেন না। এই বাড়িটা হলো ফুটবলের রাজপ্রাসাদ, এখানে থাকেন ফুটবলের রাজা পেলে।

ও দেশটার নাম ব্রেজিল, এদেশটার নাম ভারত। অনেকে বলেন আমাদের দেশে চেষ্টা করলেও কেউ নাকি পেলে হতে পারবে না। কথাটা বিশ্বাস করা যায় না। কিছু না পাওয়া দেশে যদি চুনি, বলরাম, পি কে, সালে সোমানা, সামাদ হয়, তবে কিছু দিলে ওদের মধ্যেই কেউ হয়ত পেলে হতে পারতেন।

আমাদের ফুটবল গরীব। এখানে রাজা নেই, আছে গোলাম। গরীবের রাজত্বে জীবনের নেই কোন নিরাপত্তা। পেট চালাতেই এখানে হতে হয় হয়রানি,—অতএব পেলের মতো খেলোয়াড় এখানে থাকবে একথা ভাবাও মুস্কিল, অন্যায়। আগে এদেশকে ফুটবলের বাসযোগ্য করে তোলা হোক, তারপর ভাবা যেতে পারে পেলের কথা। নচেৎ পেলের ছবি দেখেই চিরকাল আমাদের ফুটবলকে বঞ্চিত থাকতে হবে। পেলের ছবির ওপর চুমু খেয়ে বলতে হবে—গুরু! তুমি গুরু হে, ফুটবলাধীশ পেলে!

সিনেমার পর্দায় পেলের মন্থর ভঙ্গিমায় খেলার পদ্ধতি দেখে এসে আমার পাড়ার দশ বছরের বিলটু পরের দিন সকলের কাছে সার্টের কলার উল্টে বলেছিল—আমি পেলের খেলা সিনেমায় দেখে এসেছি। পেলে, ফুটবলের রাজাকে দেখেছি সিনেমায়। বন্ধুরা ওকে ছেঁকে ধরেছিল। বড় বড় চোখ করে বিলটু বন্ধুদের মাঝখানে বসে জমিয়ে তখন বলছিল পেলের খেলার গল্প।

কত মানুষ আর একটা লোক। বলটা তখন পেলের পায়ে। বলটা পায়ের সঙ্গে যেন আটকে গেল আঠার মতন। কত জনকে কাটালেন বল পায়ে নিয়ে, ডান দিকের শরীর ছুঁয়ে বুকের ওপর

দিয়ে গড়াতে গড়াতে বলটাকে তিনি নিয়ে এলেন বাঁ দিকে, তারপর তিনি বাঁ পায়ের টো-এর ওপর বলটা নাচিয়ে ঘুরে গিয়ে করলেন জোরালো শট। উঃ—কি জোর ছিল বলটায়। ছবির মতন সুন্দর, নিখুঁত।

ছেলের দল গোল হয়ে বসে শুনছিল। শুধু ছেলে কেন ওর চাইতে যারা বয়সে বড় তারাও দাঁড়িয়ে পড়েছিল বিলটুর কথা শুনে। ভাবছিলেন হয়তো বা সকলে মনে মনে,—কি সাংঘাতিক। কি আশ্চর্য! ঠিক এ যেন যাদুমন্ত্র, মায়ার ইন্দ্রজাল।

ঠাকুমা বলেছিল—কি এত বকবক করছিস সারা দিন ধরে।

বিলটু বলেছিল—পেলের কথা—

পেলে সে আবার কে? সত্তরের ঠাকুমা স-বিস্ময়ে প্রশ্ন ক'রেছিলেন।

বিস্ফারিত চোখে বিলটু ঠাকুমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল—সে কি ঠাম্মা, তুমি পেলের নাম শোননি।

—"কেন তিনি বুঝি ঠাকুর দেবতা কেউ?"

—হ্যাঁগো তিনি হচ্ছেন ফুটবলের নারায়ণ।

বৃদ্ধা ঠাকুরমার কানে এত কথা পৌঁছলো না। শুধু শুনেছিলেন নারায়ণ কথাটা। দু'হাত জোড় করে ঠাকুমা অপরাধীর মতো ভঙ্গিতে কপালে ঠেকিয়ে বলেছিলেন—পাপ নিও না ঠাকুর! তোমায় চিনতে পারিনি।

গোলকীপার পেলে

১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাস।

ব্রেজিলে এফ. এ. কাপ সেমিফাইনাল খেলা চলেছে। স্যাণ্টোস খেলছে স্থানীয় দল পোর্ট এ্যালেগারো দলের বিরুদ্ধে। গোটা মাঠ

কানায় কানায় ভরা। খেলতে নেমেই পেলে দিয়েছিলেন দুটি গোল। স্যাণ্টোস দল এগিয়ে আছে। হঠাৎ সেই মুহূর্তে স্যাণ্টোসের গোলরক্ষক গীলমার একটা মারাত্মক ভাবে গোল বাঁচাতে গিয়ে হলেন আহত। মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন আহত গীলমার। বাইরে থেকে ফার্স্ট-এইড-এর জন্য ছুটে এলেন ক্লাব ডাক্তার। গুরুত্ব বুঝে আহত গীলমারকে নিয়ে যাওয়া হলো মাঠের বাইরে।

এখন উপায়—স্যাণ্টোসের সেরা গোলকীপার গীলমার মাঠে থাকছেন না, তার জায়গায় কে খেলবেন? তখনও পর্যন্ত কোন অতিরিক্তকে খেলতে সুযোগ দেওয়া হতো না, একজন আহত হবার পরিবর্তে। সবাই যে যার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। কেউ খেলতে রাজী নয় গোলে। দূরে দাঁড়িয়েছিলেন পেলে, তিনি আর সকলের মুখের ভাব দেখে বুঝলেন সমস্যার গুরুত্বটা। তাই আর কোন কিছু না বলে ছুটলেন মাঠের বাইরে, যেখানে গীলমারকে ঘিরে শুশ্রূষা চলেছে।

নিজের গায়ের জামা খুলে, তিনি গায়ে পরলেন গীলমারের জামা। নতুন সাজে সজ্জিত পেলে স্যাণ্টোসের এক নম্বর জামা গায়ে দিয়ে এসে দাঁড়ালেন গোলে। গোটা মাঠ পেলেকে নতুন সাজে সজ্জিত হতে দেখে তো থ। পেলে গোলকীপার খেলবেন,—এই খেলা দেখতে কি তারা এসেছিল মাঠে। যে রাজকুমারের পায়ের মূল্য ২০,০০০ টাকা তিনি কিনা সেই পায়ের কারিকুরি দেখাবেন না! কিন্তু কি করবেন পেলে, গোল রক্ষার জন্য একজনকে তো দায়িত্ব নিতেই হবে। গোল দেবার দায়িত্ব নয় তার, কিন্তু গোলকে রক্ষা করার মতন দলের মধ্যে কেউ নেই।

দলের কয়েকজন এগিয়ে এসে পেলেকে বললেন—আপনি গোলে খেলবেন?

পেলে বললেন সবিস্ময়ে—কেন খুব বেমানান লাগছে আমায় এক নম্বর জার্সি গায়ে দিয়ে?

—খুব স্বাভাবিক।

হাসতে হাসতে পেলে সেই সঙ্গীটির পিঠে হাত রেখে বললেন—ভয়

নেই, আমি দুটো গোল দিয়ে দলকে এগিয়ে রেখেছি, এখন তোমরা ঠিক মতো খেলে যাও।

ফুটবলের পেলেকে দেখা গেল গোলকীপারের ভূমিকায়। পেলেকে গোলে দেখে বিপক্ষ দল ভাবলে, পেলে আর গোলে কি খেলবেন. এই হচ্ছে স্যান্টোসকে জব্দ করার একটা সুযোগ। পেলের সব ব্যাপারে বাড়াবাড়ির আত্মগরিমাকে এইবার ভাঙবে তারা।

খেলা শুরু হলো, দুই দলই মরিয়া। বিপক্ষ দল গোল করলো বটে, তবে এই গোল-এর জন্য বেশ তাদের খাটতে হলো। পেলে সহজে গোল ছাড়লেন না। এবং একবার তিনি একটি দুরূহ শটকে চমৎকার বডিথে্রার সাহায্যে বাঁচালেন পাকা গোলকীপারের মতন। খেলা শেষ হবার মুহূর্তে পেলে রক্ষা করলেন হেডের সাহায্যে পেনাল্টি সীমানার মধ্যে বিপক্ষ দলের একটি দুরূহ সেন্টারকে, সেটির সাহায্যে যে কোন দলের যে কোন ফরোয়ার্ড গোল করতে অভ্যস্ত।

খেলা শেষ হলো এক সময়। স্যান্টোস জিতলো ম্যাচ ৪-৩ গোলে। সেমিফাইনালের মতো একটা জোরদার খেলায় পেলে গোলকীপার খেলে একদিকে যেমন তিনি দলের ভিতর সেদিন এনেছিলেন নতুন প্রেরণা, তেমনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে তার পক্ষে ফুটবলের সব পজিশনেই খেলা সম্ভব। কারণ ফুটবলের তিনি প্রেমিক, তিনি রাজা, তাই ফুটবল তাকে ঠকাবে না।

খেলোয়াড় পেলে

পেলে আত্মবিশ্বাসী—! ফুটবলের কাছে পেলে যা খুশী তাই পারেন করতে, এ বিশ্বাস শুধু একা পেলের নয়, গোটা ফুটবল প্রিয় মানুষের। কিন্তু এই বিরাট শক্তিধর মানুষকেও একদিন দুর্বলের ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল, অবশ্য একথা তিনি বলেছিলেন একমাত্র তার এক বন্ধুকে। যে পেলের পায়ে বল পড়লে নির্ঘাত গোল হয় সেই

পেলে পর পর দুটো ক্লাব ম্যাচে কোন সুবিধা করতে পারলেন না। সবাই একটু অবাক হলো। সকলের চাইতে অবাক হলেন পেলে নিজে। ভাবতে বসলেন তার নিজের কথা। হঠাৎ এমন কেন হলো। ভাবতে গিয়ে তার মনে পড়লো, কয়েকদিন আগে তিনি তার এক অনুরাগীকে একটা জার্সি দিয়েছেন উপহার। মানুষের মন দুর্বলতায় ভরা। পেলে একজন মানুষ, তাই মনে হলো ওর জার্সিটাই তার গুডলাক ছিল। সেই গুডলাক জার্সিটাকে তিনি হাতছাড়া করে এমনি ভাবে নিজের ডেডলাইনকে নিজেই ডেকে এনেছেন। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে তিনি কাকে সেদিন ওই জার্সিটা দিয়েছেন তার খেয়াল নেই, কি করে তিনি ফেরত চাইবেন। মানসিক দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত পেলে নিজের দুর্বলতার কথা কাউকে বলতেও ঠিক ভরসা পেলেন না। শেষে নিরুপায় হয়ে বললেন তার এক বন্ধুকে। পেলের মুখে সমস্ত কথা শুনে বন্ধুটি বললেন, তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই, আমি দেখছি কিভাবে সাহায্য করতে পারি এ ব্যাপারে।

কয়েকদিন পর সেদিন ছিল স্যান্টোসের খেলা। পেলে চিন্তাচ্ছন্ন মনে ড্রেস পরে পায়চারি করছিলেন ক্লাব তাঁবুতে। হঠাৎ তাঁর সেই বন্ধুটি এসে হাজির। বললেন পেলেকে, এত ভাবনার কারণ নেই, এইটি তোমার সেই আদরের জার্সি, তবে আমায় কোন প্রশ্ন করো না।

খুশীতে মন ভরে উঠল পেলের। দ্রুত বদল করলেন জার্সি। পুরানো জার্সি গায়ে দিয়েই তিনি আবেগে জড়িয়ে ধরলেন বন্ধুকে।

বন্ধু বললেন এই তিনদিন তুমি কিছুই খেলোনি, কেবল ফাঁকি দিয়েছ। আজ তোমায় কিছু খেলতে হবে।

নিশ্চয়ই! মাঠে নামলেন পেলে, কয়েকদিন বাদে আবার পেলেকে দেখা গেল পেলের নিজস্ব ভঙ্গিমায়। এই খেলায় স্যান্টোস জিতলো ৬-০ গোলে। তার মধ্যে পেলে করলেন ৪টি গোল।

অবাক হয়ে ভাবতে হয় যে তার মত খেলোয়াড়ও মানসিক দুর্বলতায় ভুগে ছিলেন। আসলে দোষ পেলের নয়, তিনি মানুষ, এটাই হলো তার দুর্বলতার প্রমাণ।

পেলে দুর্বল—ফুটবলের কাছে তিনি পরাজিত, একথা বলতে তার অতি বড় শত্রুও রাজি নয়।

পেলে রাজা—ফুটবলের রাজা। ফুটবলের মধ্যেই পেলের সম্মান। ফুটবলকে কিছু দিতে আসাই হলো তার উদ্দেশ্য।

১৯৬৪ সাল। হাঁটুর ব্যথায় পেলে বেশ কয়েকমাস হয়ে পড়লেন শয্যাশায়ী। অতএব ম্যাচ খেলা সম্ভব হল না। মাঠে পেলে নেই তাই এই ফাঁকে সর্বোচ্চ গোল দিলেন ক্লোডিও। দু সপ্তাহ বাদে মাঠে নামলেন পেলে। তখন লীগের খেলায় ক্লোডিওর নাম সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসাবে সকলের ওপরে।

প্রথমদিন মাঠে নেমেই পেলে করলেন পাঁচটি গোল। দ্বিতীয় খেলায় স্যান্টোস জিতলো ১১-০ গোলে। পেলে করলেন গুনে গুনে আটটি গোল।

শেষ পর্যন্ত লীগ শেষে সর্বোচ্চ গোল দাতার সম্মান এল পেলের হাতে। পেলে তুমি চিরকালের পেলে।

সে চলে যায়

ফুটবল, এবার আমাকে বিদায় দাও। তুমি আমায় অনেক দিয়েছ। তোমার দেওয়া ঋণে নুয়ে গেছে আমার শরীর। আমাকে তুমি যা দিয়েছ, একটা মানুষের জীবনে এত পাওয়া সম্ভব নয়। আমি সব পাওয়ার অতিরিক্ত কিছু পেয়েছি। আজ বড় লজ্জার সময়, তবু আমায় বলতে হবে, অকপটে স্বীকার করতে হবে তোমার কাছ থেকে পাওয়া আন্তরিকতাকে, ভালোবাসাকে। তুমি আমায় ভালোবাসো, ভালোবাসায় তুমি আমায় দিয়েছ রাজসম্মান, আমি হয়েছি তোমার ভালোবাসার এক রাজা। আমি ফুটবলের রাজা, আমি পেলে—ফুটবলের বাদশা।

যে কিছু দেয়, তাকেও কিছু দিতে হয়। শুধু নেব, কিছুই দেব

না, তা দিয়ে তো আর পৃথিবীতে টিকে থাকা যায় না। আমি যতদিন পেরেছি, তোমায় কিছু দেবার চেষ্টা করেছি। আমার যা কিছু ছিল তা দিয়ে তোমায় ভরে দিয়েছি। আজ কেন জানি না শুধু মনে হচ্ছে, আর আমি তোমায় কিছু দিতে পারবো না। আমি ফুরিয়ে যাচ্ছি, সম্পূর্ণ-ভাবে শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই তাই আমি বিদায় নিতে চাই তোমার কাছ থেকে।

ফুটবল তুমি চোখের জল ফেলো না। যাকে ভালোবাসা যায় তার চোখের জলের টানে যে পিছুটানের একটা আকর্ষণ থাকে। তুমি আমায় অনেক দিয়েছ, অনেক ঋণী করেছ, আর করো না। এবার আমায় যেতে দাও।

জুলেরিমে নিয়ে ঘরে ফেরার পর পেলে বলেছিলেন—আমি পারি এখনো খেলতে। এখনও আমি চেষ্টা করলে বিশ বছর আঁকড়ে ধরে রাখতে পারি ফুটবলকে। কিন্তু সে অভিপ্রায় আমার নেই। আগামী বিশ বছরে বিশজন তরুণ খেলোয়াড়ের আমি পথের বাধা হতে চাই না। নতুনদের পথ করে দিয়ে, আমি সরে যেতে চাই ফুটবল থেকে। স্যার স্ট্যানলি ম্যাথিউজ পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত ফুটবল খেলেছিলেন, আমিও পারি—।

পেলেও পারতেন পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত ফুটবলকে নিজের সঙ্গে জিইয়ে রাখতে। কিন্তু পেলে ইজ পেলে। তিনি সকলের চাইতে শ্রেষ্ঠ। পেলে ফুটবলকে ভালোবাসেন, তাই বোঝেন আর একজনের যন্ত্রণাকে। নতুনকে জায়গা করে দিতে, তাই তাঁর মতন খেলোয়াড়ের বুক কাঁপলো না। সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন মিঠে গলায়, এবার আমায় ছেড়ে দিন। আর নয়, অনেক তো হলো ! আমি অনেক পেয়েছি, আর আমি পেতে চাই না। আমি ঠিক করেছি জাতীয় দল থেকে বিদায় নেব।

১৯৬৬ সালে বিশ্বফুটবল খেলে আসার পর এমনিভাবে ফুটবল থেকে বিদায় নেবার কথা বলেছিলেন পেলে। সবাই ভেবেছিল সত্তরের খেলাটাও শেষ পর্যন্ত এমন কিছু হবে। কিন্তু সেবার পেলে বলেছিলেন খেলায় হেরে যাবার পর রাগে, দুঃখে, অপমানে, লজ্জায়।

এবার পেলে বিদায়ের কথা ঘোষণা করলেন জুলেরিমে পাবার পর। বলার মধ্যে তাই আছে অনেক তফাৎ।

নিজের কথা বলতে গিয়ে বেদনাহত গলায় বললেন পেলে—অন্যের জায়গা দখল করে থাকাটা অপরাধ, পাপ।

আমি চাই না একজন নতুন খেলোয়াড়, শুধু মাঠের বাইরে বসে আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে শেষ হয়ে যান। আমি তাদের জায়গা করে দিতে চাই। আমি চাই আর এক পেলে আসুক আমার জায়গায়। পেলের বাইরেও আর একটা পেলে আছে, যে পেলে আত্মপ্রকাশের জন্য অপেক্ষা করছে।

চোখ ঝাপসা হয়ে উঠেছিল। গাল বেয়ে নেমেছিল অশ্রু। সবাই বলেছিল রাজা, সত্যি তুমি বিদায় নেবে, আর তুমি আসবে না আমাদের কাছে। আর তোমাকে পাবো না দেখতে খেলার মাঠে।

—না, আর নয়। এবার আমায় যেতে দাও। সুন্দর ফুটবল, তুমি আমার ভালোবাসার, তোমায় আমি কোনদিন ভুলবো না, ভুলতে পারি না।

১১ই জুলাই, ব্রেজিলের স্টকহোমে সে একদিন। পেলে নেমেছেন খেলতে। সাওপাওলোর মাঠে তিল ধারণের জায়গা নেই। মানুষ আর মানুষ। আজ মাঠে এসেছে অনেক মানুষ, খেলা পাগল মানুষ, ফুটবলের রাজাকে বিদায় জানাতে। খেলা হচ্ছে ব্রেজিল বনাম অস্ট্রিয়া।

জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে শুরু হলো ব্রেজিলের জাতীয় খেলা ফুটবলের। পেলে মাঠে নামলেন। আঠারো মিনিটের মাথায় প্রথম বল পড়লো পেলের পায়ে। নিখুঁত ভঙ্গিতে বলটা পায়ে নিয়ে পেলে দৌড়ালেন। কাটালেন একজন একজন করে সাত সাতজনকে, তারপর অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় খুশীর খেয়ালে করলেন জোরালো শট। ৩৬ গজ দূরে দাঁড়িয়ে পেলের এই শট ঢুকে গেল গোলের মধ্যে।

এই শেষ আর খেললেন না পেলে। প্রথমার্ধের পর বেরিয়ে গেলেন মাঠের বাইরে।

খেলা শেষ। অনুষ্ঠান শেষে হাজার হাজার জনতার চোখের সামনে স্থানীয় এক লরি ফেডারেশান ১৫০০ ডলারের একটা ঘড়ি উপহার দিলেন পেলেকে। দুহাত তার কাঁপছিল। চোখ জোড়া ভরে উঠেছিল জলে। মাঠের বাইরে অগণিত মানুষ ডুকরে উঠছিল পেলেকে দেখে সেই মুহূর্তে। পেলে বলেছিলেন বুঝি বা অমন করে তোমরা আমায় ডেকো না, আমার ভীষণ মনে পড়ছে তোমাদের, আমার প্রিয় ফুটবলকে।

ফুটবল থেকে প্রায় একই সঙ্গে সরে গেলেন তিন তিনজন রত্ন। ফুটবলের রাজা পেলে, এশিয়ার প্রিয় লেভ ইয়াসিন আর জার্মান প্রেমিক উয়ে সীলার। ওরা তিনজনেই বিশ্বফুটলের আকর্ষণ।

পেলেকে তবু ছাড়লো না ফুটবল। দর্শকের অনুরোধে, ফুটবল ফেডারেশানের কথায় আবার মাঠে একদিন নামতে হলো পেলেকে।

১৮ই জুলাই, ১৯৭১ সাল। বরণীয় ফুটবলের স্মরণীয় মুহূর্ত। পেলে নামলেন মাঠে। এই তার শেষ খেলা। যে যেখানে ছিল সবাই এলো। যে যে ভাবে পারলো সে ভাবেই এলো। সবাই কিছু না কিছু নিয়ে এলো আসার সময়, কিছু একটা দেবার জন্য পেলেকে। যিনি একদিন হাজার হাজার মানুষকে ভালবেসে অনেক দিয়েছেন।

মারাকানা স্টেডিয়াম কানায় কানায় ভরা। খেলা শুরু হলো ব্রেজিলের যুগোশ্লোভিয়ার বিরুদ্ধে। এই হলো পেলের শেষ খেলা। আর নয়। শেষ মানে চিরকালের, চিরদিনের। পেলেকে শেষ বার দেখার জন্য গোটা মাঠ জুড়ে এলো অসংখ্য মানুষ। সাতদিন আগেই টিকিট গেল ফুরিয়ে। দু-লাখেরও বেশী লোক ছিল সেদিন মাঠে। রাজা মাঠে নামলেন সেদিন ত্যাগীর ভূমিকায়। একি বেশ, এ কি তার চলে যাবার বেশ—তবে কি সত্যি সত্যিই তিনি চলে যাচ্ছেন। মন যেন মানতে চায় না।

মাঠে নেমে সেদিন যেন কি হয়েছিল পেলের। খেলতেই পারলেন না। চোখ ছলছল করছিল, ব্যথায় ভরে উঠছিল মন। প্রাণের প্রিয় ফুটবলকে তাঁর চিরদিনের জন্য ছেড়ে যেতে হবে। ভাবতে গিয়ে হয়ত

বিহ্বল হয়ে উঠেছিলেন। তাই পনেরো মিনিট পর চলে গেলেন মাঠের বাইরে।—না, আমি পারছি না, পারছি না আর এক মুহূর্ত মাঠে দাঁড়াতে।

পেলে চলে যাচ্ছেন, এ যেন এক মুহূর্ত। এর আগে কত ফুটবলার তো চলে গেছেন, কই তার জন্য তো এত বিচলিত হয় নি ফুটবল। তবে আজ কেন সে এত চঞ্চল হলো, এত অস্থির। বিরতির সময় আবার মাঠে এলেন পেলে। গোটা মাঠ হাত জোড় করে ঘুরলেন তিনি। বিদায় জানাচ্ছেন শেষবারের মতন, যেন বলতে চাইছেন সবাইকে—তোমরা আমায় ক্ষমা কর। আমি পেলে, তোমাদের কাছে নতজানু হয়ে ক্ষমা চাইছি। আমায় তোমরা যেতে দাও, বিদায় দাও।

যে যা পারলো ছুঁড়ে দিল দূর থেকে। ফুলে ফুলে ভরে গেল মারকানা। খেলার মাঠ হয়ে উঠল সুরভিত সৌরভে মাতোয়ারা। মনে হলো ফুলের বাগানে দাঁড়িয়ে যেন এক স্বপ্নের রাজকুমার। গায়ের জার্সিটা খুলে ফেললেন। প্রিয় দশ নম্বর জার্সি। একে একে ব্রেজিলের দশজন বাকি খেলোয়াড় খুললেন গায়ের জামা—দিলেন পেলের হাতে। বললেন সকলে—আমরা তোমাকে দিলাম।

কাঁদছেন পেলে, অসহায় শিশুর মত দেখতে লাগছিল তাঁকে। শেষে না পেরে তিনি অধিনায়ক গ্যারমনের জামায় মুছে নিলেন তার অশ্রুসিক্ত চোখ জোড়া। বললেন সকলের দিকে তাকিয়ে—একি তোমরা কাঁদছ কেন, কই আমি তো কাঁদতে পারছি না তোমাদের মতো। দেখ আমি কত নিষ্ঠুর। আমি ফুটবল ছেড়ে চলে যাচ্ছি, অথচ আমি কাঁদতে পারছি না।

সেদিন অনুষ্ঠানে ব্রেজিলের ক্রীড়া সংস্থার সভাপতির পক্ষ থেকে পেলেকে দেওয়া হলো একটি সোনার মেডেল। রূপোর ফলক। যুগোশ্লোভিয়ার তরফ থেকে পেলের মাথায় পরানো হলো সোনার মুকুট।

ইথার তরঙ্গে ভেসে এলো দূর পাল্লা থেকে অসংখ্য রাষ্ট্রদূতের

কণ্ঠস্বর। প্রেসিডেন্ট টিটো পেলেকে ধন্যবাদ জানিয়ে পরিয়ে দিলেন "অর্ডার-অব-যুগোশ্লাভ-ফ্লাগ"।

আর, আর কি পাবার আছে। পেয়েছেন অনেক কিছু। নতজানু হয়ে সেদিন ফুটবলের সামনে বসে কান্নাভেজা গলায় পেলে বললেন—ফুটবল, তুমি আর আমায় কিছু দিও না, আমি আর কাঁদতে পারছি না।

—আমি ক্লান্ত—। অনেক পেয়ে আজ আমি পর্যাপ্ত পাবার ভারে অবসাদগ্রস্ত। নুয়ে গেছে আমার শরীর।

ব্রেজিলের তরফ থেকে টেলিপ্রিণ্টে খবর গেল পৃথিবীর আনাচে কানাচে—

'Pele is no more in the football world'. বিদায় নিয়েছেন পেলে।

গোটা বিশ্ব সেদিন স্তম্ভিত হয়ে উঠেছিল এই সংবাদেঃ পেলে বিদায় নিয়েছেন। ফুটবলের রাজা, পেলের পায়ে আর দেখা যাবে না বল, আর কোনদিনের জন্য তিনি মাঠে নামবেন না।

১৮ই জুলাই বিদায় নিয়েছেন পেলে। ফুটবলের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন।

বিশ্বের সাংবাদিকেরা ঘিরে ধরলেন পেলেকে। পেলে বললেন হাসিমুখে—আর আমায় কেন, আর আমার কাছে আপনাদের পাওয়ার কি আছে। আমি এবার একটু স্বস্তি পেতে চাই।

—এত তাড়াতাড়ি বিদায় নিলেন কেন?

—নতুনকে জায়গা দেবার জন্য।

—অন্য আর কিছু?

—হুঁ, আমার স্ত্রী রোজিমেরির কথা ভেবে। ওকে আমি বিয়ের পর কিছুই দিতে পারিনি। এবার ফুটবল ছেড়ে আমি ওকে কিছু দিতে চাই।

পরিশেষে সাংবাদিকদের বললেন—তবু আমি বিশ্বকাপে ব্রেজিলের সঙ্গে থাকবো।

সবাই তাকালো পেলের দিকে।

পেলে বললেন—আমি ব্রেজিলের কাছে ঋণী। খেলা ছেড়ে দিলেও, আমি খেলা দেখে বেজিলকে প্রেরণা দেব। ব্রেজিলের ফুটবল আমার প্রাণ, ও আমায় অনেক দিয়েছে। কবির ভাষায় হয়ত বা পেলে বলেছিলেন—

“এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি।”

সাংবাদিক পিটার লরেঞ্জ বলেছেন—“There never has been a footballer quite like him, I wonder, if there will ever be another.”

লরেঞ্জের ভাষায়, আরো বলতে গেলে—এই খেলোয়াড়টা সত্যিই ফুটবলের রাজা। রাজার মতো ওঁর আচরণ, ভঙ্গিমা। রাজার মেজাজটি পেলে কখনও নষ্ট করেন নি। তিনি নিজে একজন স্বয়ং সম্পূর্ণ জাতীয়তাবাদী আদর্শ। সেই কারণেই মহান নেতার তুলনায় তার যোগ্যতার স্থান অনেক উঁচুতে। গোটা ব্রেজিলকে তিনি ফুটবলের মাধ্যমে এক করেছেন, তিনি ব্রেজিলের জাতীয় সম্পদের মতো মূল্যবান। পৃথিবীর একটি সেরা বিস্ময়। আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় বলতে পারি এমনটি আর কখনও দেখিনি। ওঁকে দেখে আমার ইহকালের জনম সার্থক হয়েছে। পেলেকে খুব কাছ থেকে দেখা হলো ঈশ্বর দর্শনের মতো কঠিন সাধনা। আমি ওঁকে দেখেছি—দেখেছি মাত্র তিনবার—আমি আজীবন তার জন্য গর্বিত।

বৃটিশ সাংবাদিকের ভাষায়—‘আমি আমার নব বিবাহিতা পরমা সুন্দরী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে পারি পেলের একটি খেলা দেখার বিনিময়ে।’

এক ফরাসী সাংবাদিক অভিভূত হয়ে বলেছিলেন—‘আমি ওঁকে কিসের সঙ্গে তুলনা করবো ভেবে পাইনি। প্রথম ওঁকে দেখার পর ওর পায়ে বল পড়ার পর থেকে আমি কি লিখবো, তাই ভাবতেই সময় লেগেছে আমার গোটা এক মাস। পেলেকে আসলে কোন

কিছুর সঙ্গেই তুলনা করা যায় না। পেলেকে একমাত্র পেলের সঙ্গেই তুলনা করা চলে।'

রুশ সাংবাদিকের কলম থেকে ঝরেছিল একটি কথা—'লেনিন যদি একটি নাম হয়, তা পেলে হলো আর এক নাম।'

বিশ্বের সাংবাদিক ছাড়া খেলোয়াড়দের মধ্যেও অনেকে অনেক মন্তব্য করেছেন পেলের সম্পর্কে। ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক ববি মুর ১৯৬৪ সালে ৩০শে তারিখে মারকানা স্টেডিয়ামে হারার পর বলেছেন —'পেলেকে ব্রেজিল দল থেকে সরিয়ে নাও, আমরা তাহলেই জিতবো নচেৎ পারবো না। 'He is supernatural.'

পরে ববি মুর আরো পরিষ্কার করে বলেছেন—ফুটবল হলো আবেগের খেলা, আমার বিশ্বাস আর কোন ফুটবলার পেলের মতো এমন হৃদয়গ্রাহী নয়।'

পর্তুগালের প্রিয় ইউসোবিওর ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়— 'যে যাই বলুক, আমায় অনেকে বলেছেন আমি পেলের চাইতেও বড়। আমার তাদের কাছে অনুরোধ, আমায় বড় বানাতে গিয়ে তাঁকে ছোট করবেন না। তিনি রাজা, ফুটবলের বাদশা, আমরা তার কাছে গোলাম ছাড়া কিছু নই। ওর কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে।'

ববি চার্লটনের ভাষায়—'আমি খেলবো কি, শুধু ওকে তাকিয়ে দেখি, ফুটবল সে কোন রীতিতে খেলে। ফুটবল ওর কাছে কবিতার মতো মিষ্টি।'

প্রবীণ বৃটিশ সাংবাদিক বলেছেন—"ম্যাথিউজ, গ্রীভস্, হিডেকুটি, পুসকাস, স্টেফানো—প্রত্যেকেই অসাধারণ গুণের অধিকারী। কিন্তু একমাত্র পেলের মধ্যেই আছে এদের সকলের গুণাগুণ সংহতি।"

পেলের একদা গুরু ফিওলা সাহেবের ভাষায়—'পেলে তুলনাতীত। বল নিয়ে সে যা খুশী তাই করতে পারে, যা আর কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। ইউসোবিও, ববি মুর, চার্লটন সকলেই ভালো উঁচু জাতের খেলোয়াড় তার বেশী আর কিছু নয়।'

আমরা ভারতবাসী, মহান পেলে দর্শনে বঞ্চিত। তাই আমরা

কেউ মুখ খুলতে পারি না। তবে তাকে না দেখেই বলবো, তিনি সূর্যের মতো অপ্রতিদ্বন্দ্বী অদ্বিতীয় একজন সত্যিকার ফুটবলার।

সত্যিকার তিনি রাজার রাজা—ফুটবলের সম্রাট।

পেলের জনপ্রিয়তা

জনপ্রিয় সবাই হয়। কে না হতে চায় জনপ্রিয়, কিন্তু ভাবতে পারা যায় একটা মানুষের কথা, যাকে দেখার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাজার হাজার মানুষ রাস্তার তু'ধারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। জুলিয়াস সীজার যখন যুদ্ধ জয় করে ফিরছিলেন নিজের দেশে, ঠিক এমনি এক সাদর অভ্যর্থনার কথা লিখেছেন মহান কবি শেক্সপীয়ার।

বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছেন চুপিচুপি। কেউ যেন জানতে না পারে। কেউ জেনে ফেললেই বিপদ। গিয়েছেন বন্ধুর পাঠানো গাড়িতে। ঢুকেছেন পিছনের দরজা দিয়ে। বসে কথা বলছেন ওরা। হঠাৎ শোনা গেল বাইরে গুঞ্জন। সবাই অবাক। কি ব্যাপার! বাইরে এত গণ্ডো-গোল কেন। বন্ধুর বেয়ারা এসে খবর দিলে—অসংখ্য মানুষ বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে, তারা একবার মিঃ পেলেকে দেখতে চান।

সর্বনাশ! একটু গল্প করার উপায় নেই। বন্ধু তাকালেন। পেলে বললেন—কি আর করবে। ওরা যখন এসেছে শুধু তো দেখবে, কিছু তো চাইবে না।

এ কি শুধু দেখা! প্রায় তু'ঘণ্টা ধরে দেড় হাজার সই দিলেন পেলে। কাউকে ফেরালেন না। যে যা আনলো তাতেই সই করলেন, বাসের টিকিট তাই সই, তিনি ফেরালেন না কাউকে। বরং বললেন—দেখুন আর কেউ বাদ গেলেন না তো?

এই হচ্ছেন পেলে, এই হচ্ছেন মানুষ পেলে, যিনি খেলার শেষে তার গায়ের জার্সি খুলে একটি অল্প বয়স্ক গরীব হকার ছেলের হাতে দিলেন। পরে সেই জার্সির নিলামে দাম উঠেছিল—দেড় লক্ষ টাকা।

কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, কাকে তিনি কি দিচ্ছেন। পেলে সম্পর্কে মন্তব্য রাখতে গিয়ে তার এক বন্ধু বলেছেন—পেলে এখনও আগের মতোই আছে। আগেও যেমন ছিল, এখনও সেই রকম।

রাস্তায় তিনি বেড়াতে বেরুতে পারেন না। চোখে পড়লেই মানুষ তাকে অতিষ্ঠ করে তোলে। শুরু হয়ে যায় কাড়াকাড়ি। কেউ জামা ধরে টানে, কেউ হাত ধরে, কেউ বা প্রকাশ্য রাজপথে চুম্বন করে পেলেকে। পেলে নীরব। ছেঁড়া জামা পরেই ফিরে আসেন বাড়ি।

একবার কোন এক জায়গায় গিয়ে আটকে পড়েছিলেন, সবাই ঘিরে ধরলো গাড়ি। বললে—আমাদের তোমার কিছু দাও।

কি দেবেন পেলে, কি আছে তাঁর। তবু মানুষজন নাছোড়বান্দা। প্রথমে পকেটে যা ছিল ছুঁড়ে দিলেন, তারপর পেন, হাতঘড়ি, আংটি বোতাম, জুতো, মোজা, জামা তারপর পরনের প্যান্ট।

তখনও সবাই চিৎকার করছে—দাও, শুধু তুমি দিয়ে যাও, আমরা এখনও কিছু পাইনি। আমাকে দাও, আমাকে দাও।

শেষে তিনি নেমে এলেন গাড়ি থেকে শুধু মাত্র পরনে একটি ছোট প্যান্টি পরে। বললেন—থাকার মধ্যে আছে আমার এই গাড়িটা, কে নেবে নিয়ে যাও!

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লো অসংখ্য মানুষ। একটা গোটা গাড়ি হলো টুকরো টুকরো। অসংখ্য টুকরো—সবাই যে যা পারলো কুড়িয়ে নিলো। সেই সুযোগে ভিড় কাটিয়ে দৌড়ে একটা ট্যাক্সি ডেকে আত্মগোপন করলেন জনপ্রিয় ফুটবলের রাজা পেলে।

এখন কফির কাপে পেলে। ব্রেজিলের রেস্তোরাঁয় বসে যুবকেরা চুমুক দেয় 'পেলে' ব্র্যাণ্ড কফিতে। স্যুট্ পরে 'পেলে' মার্কা কাপড়ের, গালে ক্রিম ঘষে 'পেলের' নামে। জুতো, মোজা, খেলার সরঞ্জাম সব কিছুতেই এখন পেলের নাম।

পেলে শুধু নাম ব্যবহারের সুযোগ দেননি সিগারেট আর মদের ব্যবসায়ীদের। তার কথা হলো, 'যা ফুটবলের ক্ষতি করে আমি তাতে

নেই। আর যা চাও আমি তাই দেব, পারবো না টাকার জন্য দেশকে ডোবাতে। জাতকে নষ্ট করতে।'

পেলের নামে ছবি তুলেছেন ব্রেজিল সরকার। নাম দেওয়া হয়েছে 'দ্য ড্রিম অফ্ পেলে'। পেলেকে নিয়ে চলচ্চিত্র।

আমি কি ছিলাম, কি হয়েছি। ছিলাম ডিকো, হয়েছি পেলে। আমি তোমাদের খেলার রাজা পেলে।

ছাড়িলে না ছাড়ে

ফুটবল থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলেন পেলে। ১৯৭১ সালের ১১ই জুলাই তারিখে ঘোষণা করেছিলেন—এই তার শেষ খেলা, আর নয়। এবার তিনি একান্ত নিজের হতে চান। যাকে নিয়ে জীবনে ঘর বেঁধেছেন, সেই স্বপ্নের রোজির কাছে এবার তিনি আপন হতে চান। ফুটবলার জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে পেলে হতে চেয়েছিলেন প্রেমিক পুরুষ। ফুটবলকে ভালোবেসে তিনি দিয়েছেন অনেক কিছু, এবার তাকে ভরে দিতে হবে রোজিকে। নীল চোখ জুড়ে ওর অনেক আশা খেলা করে।

ফুটবল ছাড়তে তার কষ্ট হয়েছিল। তবু তিনি বিদায়ের কথা ঘোষণা করেছিলেন। আবেগ মিশ্রিত কণ্ঠে প্রেমিক ফুটবলার বলেছিলেন—আমি বিদায় নিচ্ছি। আমাকে বিদায় দাও। "I am not immortal. So, all this will finish one day and I am prepared for the time.' এত কথার পরও ফুটবলের কণ্ঠ থেকে শুনেছিলাম—আবার আসিব ফিরে···! যে যায়, সে কি ফিরে আসে?

আসলে পেলে, সত্যিকারের মন থেকে ফুটবলকে বিদায় দিতে পারেন নি। ফুটবলের ভালোবাসার কিছু টান পেলেকে টেনে ধরেছিল পিছনে। চলে যেতে গিয়েও তাই ঘুরে দাঁড়িয়েছেন পেলে। দেখেছেন, ফুটবল-প্রেমিকরা নতজানু হয়ে তার কাছে প্রার্থনা করছেন—হে

ফুটবল প্রেমিক! তুমি ফিরে এস, তোমার যে আরো অনেক—অনেক কিছু দেবার আছে। বঞ্চিত করো না আমাদের।

এ এক হৃদয়বিদারক অনুরোধ, ফুটবলের দুর্বলতায় চমকে গেছেন শিল্পী। বার বার বলেছেন—অমন করে আমায় ডেকো না। আমি দুর্বল হয়ে উঠছি।

—না, তুমি আর একটি বার শুধু থমকে দাঁড়াও, চলে যাওয়ার আগে। আর একবার তুমি ভালোভাবে বিচার করে দেখ!

পিছনের ডাক, পেলেকে দিয়েছে আটকে। যে রাজা, সেকি বঞ্চিত করতে পারে কাউকে, আন্তরিকতায় শিল্পীর মনে কার্পণ্যতা থাকতে পারে না।

অবশেষে সত্তরের পেলে বাহাত্তরে এসে বলতে বাধ্য হলেন—এই আমি, সেই আমি। আমি বিদায় নিতে পারলাম না। আবার আমায় ফিরে আসতে হলো। তবে এই শেষ—১৯৭৪ সালের পর ফুটবল তুমি আর আমায় ডেকো না! আর কোন অনুরোধ আমি শুনবো না। আর পিছু ডাকে আমি ফিরে আসবো না।

দর্শকের অনুরোধে দেশেরা প্রয়োজনের তাগিদে আবার আসবো।

নিজের প্রিয় দল স্যাণ্টোসের হয়ে তিনি খেলার কথা ঘোষণা করলেন। স্পষ্ট গলায় শোনা গেল—আমি ফুটবলকে ভালোবাসি, আবার ফিরে এলাম তোমাদের অনুরোধে। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত আবার তোমরা আমাকে পাবে। আমি আমার দল স্যাণ্টোসকে বড় ভালোবাসি। আমিস্যাণ্টোসের হয়ে খেলবো। আমার দলের টাকার প্রয়োজন এবার আমি শেষ কয়েকবছর খেলবো শুধু আমার দলের আর্থিক অবস্থার কথা চিন্তা করে। টাকা আমার আর চাই না। এবারের খেলার জন্য আমি কোন টাকা নেব না দলের কাছে। বরং নিজেকে বিলিয়ে চেষ্টা করবো দলের জন্য কিছু করার। ওরা আমায় অনেক দিয়েছে।

সবশেষে একজন সাংবাদিক পেলেকে একান্তে পেয়ে প্রশ্ন করলেন—এবার কি শুধু দলের জন্য খেলবেন, দেশের জন্য খেলবেন না? ব্রেজিল তো অনেক দিয়েছে।

উত্তরে পেলে বললেন, যদি আমাকে ব্রেজিল চায়, তবে পাবে। আমি ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত আছি। আমাকে দলে নেওয়া না নেওয়ার ইচ্ছে বেজিলের ফুটবল কর্তাদের ওপর নির্ভর করছে। আমাকে যদি বলেন, আমি নিশ্চয় দলের সঙ্গে থাকবো।

পেলে ফুটবলে ফিরে এসেছে, বিশ্বের ফুটবল প্রিয় দর্শকের কাছে এ খবর পরিতৃপ্তির।

পরবর্তী আসর বসেছে মিউনিখে। সবাই ভেবেছিল মিউনিখের দুর্ভাগ্য—তার সাজানো উঠানের সুন্দর আসনে পড়বে না ফুটবল বাদশার পায়ের ছাপ। জুলেরিমেকে ঘিরে চিরকালের জন্য চলে যাওয়া ব্রেজিল দলের কালো রাজা পেলে আর আসবে না দ্বিতীয় কুমারীর সাজানো ফুটবল আসরে।

চুয়াত্তরের ফুটবল, সত্তরের ঘোষণায় মর্মাহত হয়েছিল। ফুটবলের ভাগ্য—ফিরে এলেন রাজার রাজা, ফুটবলের সেরা প্রেমিক পেলে।

সদা হাস্যময় ফুটবলের সম্রাট বললেন—আমি আছি, আমি থাকবো, চলে গিয়েও চলে যেতে পারলাম না। ওরা যে অবুঝ, ওরা আমায় ছাড়তে চায় না। ওদের চোখের জল আমায় বিহ্বল করেছে। ফুটবল, আমি তোমায় ভালোবাসি। আমি পেলে ঘোষণা করছি আগামী চুয়াত্তর সাল পর্যন্ত আমি তোমার সঙ্গে থাকবো। এই ঘোষণায় নিশ্চিন্ত হয়েছে ফুটবল। স্বস্তি পেয়েছে মিউনিখ। চুয়াত্তরের ফুটবল আসরে আবার হবে রাজার আবির্ভাব।

জুলেরিমে জয়ী পেলে চুয়াত্তরে আবার আসছেন।

তবু ভালোবাসায় প্রশ্ন থাকে, ক্ষোভ, দ্বিধা, অবিশ্বাস এই তো হলো ভালোবাসার আঙ্গিক। ফুটবলকে ঘিরে তাই আজ আবার সকলের প্রশ্ন—সত্যি,—সত্যি,—সত্যিই কি তিনি আসবেন!

হে চুয়াত্তর, তুমি আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর! তুমি আর একটিবার শুধু ওকে দেখতে দাও। ওর পায়ে দেখতে দাও বলের নাচন।

ফুটবলের শেষ কবিতা লিখতে বল ফুটবলের কবিকে!

নীরব হবার আগে আর একবারের জন্য ওকে মুখর হতে বল, আমরা যে ওর প্রতীক্ষায় আছি।

ফুটবল আবেগের খেলা। আবেগের এই খেলায় পেলে হলেন একমাত্র হৃদয়গ্রাহী। পেলের মতো এত হৃদয়গ্রাহী হতে আর কাউকে দেখিনি।—কথাগুলো বলেছিলেন ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক ববি মুর।

হে চুয়াত্তরের ফুটবল, জানিনা তোমার সর্বশেষ কোন ঐশ্বর্য প্রকাশ করবেন বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ প্রেমিক পেলে, আমরা অপেক্ষা করে আছি, আমাদের সার্থক হতে দাও।

স্মৃতির আড়ালে আমি

আমি, সেই আমি, তোমাদের প্রিয় পেলে। আজ যখন তোমরা আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে নানান কথা বল, আমি তখন বিস্ময়ে আমার নিজের কথা ভাবি। বার বার মনে হয় আমি কি সে—সেই, —সেই পেলে, নাকি অন্য কেউ?

কি দিনই না গিয়েছে আমাদের। সেদিনের কথা তোমরা কেউ জানো না। কত দুঃখ, কত বেদনা, কত অভাব। আজ যখন সেই দিনের কথা ভাবি, পুরনো স্মৃতি সামনে এসে দাঁড়ায়, আমাকে হাত-ছানি দিয়ে ডেকে বলে—'কি হে নাসিমেণ্টো, মনে আছে কি তোমার সেদিনের কথা। নাকি আজকের সুদিনে তুমি সব কথা ভুলে গেছ? ঠিক তখনই আশাবরী রাগিণী বেজে ওঠে বুকময়। দুচোখের কোল ঝাপসা হয়ে আসে। আমি মনে মনে বলি, 'হে অতীত, আমি তোমায় ভুলিনি। সব কথা কি কখনও ভোলা যায়, নাকি ভোলার?'

শহর স্যাণ্টোস থেকে বেশ কিছুটা দূরে আমাদের নির্জন গ্রাম টেসকেরাকোস। সবে মাত্র শহরের ছোঁয়ায় কেতাদুরস্ত হয়ে উঠছে। আমার বাবা ডোণ্ডিনহো ছিলেন এই গ্রামের একজন বহুদিনের বাসিন্দা।

মানুষটা ছিলেন এক সময় ফুটবল রসিক। ছোট বড় অনেক খেলা তিনি খেলেছেন। খেলাই ছিল তার জীবনের স্বপ্ন। কিন্তু সব জীবনে কি আর জীবন স্বপ্ন সফল হয়? হয় না, হয় না বলেই জীবনের ক্ষেত্রে নেমে আসে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব-ট্র্যাজেডি। এই ট্র্যাজেডি যেমন সহজ তেমনি স্বাভাবিক, মানুষকে তাই বার বার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলি হতে হয় এই ট্র্যাজেডির যূপকাষ্ঠে। মানুষটা সেদিন খেলার মাঠেই হলেন আহত। আহত হয়ে সেই যে তিনি খেলা থেকে বিদায় নিলেন, আর ফিরে এলেন না কোনদিন। সেই তার সঙ্গে ঘটলো ফুটবলের চরম বিচ্ছেদ। পেটের টান বড় কঠিন। ঘরে আমরা সাত সাতটা মানুষ। আর এই সাত জনের অন্নদাতা একজন —আমার বাবা। অভাবের সংসারে কি আর খেলা চলে, নাকি খেলা যায়। ফলে তাকে চাকরির ধান্দায় বেরুতে হলো শহরের দিকে।

সাত সকালে মানুষটা বেরিয়ে পড়তেন পেটের টানে, ফিরতেন অনেক রাতে। তখন তিনি ক্লান্ত, কারো দিকে নজর দেওয়ার মতো সময় থাকতো না, ক্লান্তিতে জুড়ে আসতো দু'চোখের পাতা।

আমি হলাম সেই অভাবী ঘরের ছেলে। ২৩শে অক্টোবর—১৯৪০ আমার জন্ম। আমার ভূমিষ্ঠ হওয়ার মুহূর্তে বাবা ঘরে ছিলেন না। বাড়ি ফিরে শুনলেন খবরটা। আনন্দে তার বুক ভরে গেল, আদর করে তিনি ছেলের নাম রাখলেন অ্যারেণ্টস-ডু-নাসিমেণ্টো। বয়েস একটু বাড়তে না বাড়তেই শুনলাম মায়ের গলায় 'সাসি' ডাক।

আমার মা বড় দুঃখী। ঘরের সমস্ত অভাবকে তিনি একলাই বুক দিয়ে আগলাতেন, কোন অভাব কোনদিন আমরা মা'র জন্য টের পাই নি। সেই বয়সে মাকে বোঝার মতো মনের গভীরতা আমার ছিল না। বরং অভাবী মাকে কত বায়নায় না উৎপীড়ন করেছি। মা কখনো কখনো সেই আবদারকে পূরণ করেছেন, কখনো বা বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আমাকে ভুলিয়েছেন। সেই বয়সে বড় রাগ হত মার ওপর। আজ বুঝি, মা কত ব্যথাই না পেয়েছেন সেদিন। সন্তানের চাহিদাকে মেটাতে না পারার অক্ষমতা যে ভারী কঠিন—এ ব্যথা সন্তান বুঝবে

কি করে। আজ আমার সেই আগের রাগ এখন আর নেই। বড় হয়েছি। চিনতে শিখেছি পৃথিবীকে এবং তার মানুষজনকে। আর এই চেনাজানাই খুলে দিয়েছে আমার মনের অক্ষম জ্ঞানবুদ্ধির ভারি দরজা, বুঝিয়ে দিয়েছে মায়ের সত্যিকার কষ্টকে। অথচ আশ্চর্য আমি কিন্তু মাকে কোনদিন অভাবের জন্য দুঃখ পেতে দেখিনি! কঠিন সেই দুঃখের মধ্যেও তিনি ছিলেন অম্লান। তার মুখের হাসি ছিল মমতা মাখানো। মায়ের এই মমতাময় চাউনি'ই হলো আমার জীবনাদর্শের মূল উৎস প্রেরণা।

সারাদিন আমি খেলি, খেলে বেড়াই। বই খুলে পড়তে ভাল লাগে না আমার। বই দেখলেই গায়ে জ্বর আসে, মনে হয় দম বন্ধ হয়ে আসছে। বরং সে তুলনায় আমি খেলার মধ্যে পাই সত্যিকার আনন্দ আর তৃপ্তি। আমার বাড়ি থেকে স্কুল—মাইল দেড়েকের রাস্তা। স্কুলে যাতায়াতের পথে একটা ছোট মাঠ নজরে পড়ে, ছেলেরা ফুটবল খেলছে। বই খাতা হাতে নিয়ে আমি থমকে দাঁড়াই। অবাক হয়ে খেলা দেখতে দেখতে ভাবি—আমি কবে বড়ো হবো। ওদের মতো অপার আনন্দে ফুটবল খেলবো। ওরা কি আমায় দলে নেবে?

খেলা দেখতে দেখতেই আমার মাথায় ফুটবলের নেশা জন্মেছিল। বই খাতার পাতা ছিঁড়ে, কাগজের বল করে, নিজেই তখন একা একা খেলতাম। কখনো বা পুরনো ন্যাকড়ায় বল বানিয়ে বন্ধুদের ডেকে এনে দল বেঁধে খেলতাম ফুটবল। সে এক অদ্ভুত আনন্দ। এই আনন্দে ডুব দিলে আমি যেন সব ভুলে যাই, আমার খেয়াল থাকে না কোনোদিকে।

আগেই বলেছি আমার বাবা ছিলেন একজন ফুটবলার। তাই ফুটবলের প্রতি যেমন ছিল তার বুকভরা ভালোবাসা, তেমনি ছিল অভিমান। ফুটবল তো তাকে কিছু দেয় নি, তিনি তো ফুটবলার হতেই চেয়েছিলেন, বরং ফুটবল তার সর্বস্ব নিয়ে নিঃস্ব করে দিয়েছে। সেই কারণে ফুটবলের ওপর আমার স্নেহ তার ভাল লাগলেও, তিনি মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠতেন।

কিন্তু সে সংশয় তার বেশী দিন ছিল না। যিনি সত্যিকার ফুটবলার, তিনি কি পারেন কখনো ফুটবলের ওপর রাগ করতে। তাই একটু একটু করে তার মন গলে গেল। আড়াল থেকে আমার খেলা দেখে গোপনে তিনি প্রার্থনা করেছেন প্রতিদিন।

বয়স আমার বাড়ছিল, সেই সঙ্গে গড়ে উঠেছিল আমার কালো রঙের পেটানো শরীর স্বাস্থ্য। কে বলবে আমায় দেখে আমি একজন অভাবী ঘরের ছেলে, দু' বেলা দু' মুঠো পেট ভরে খেতে পর্যন্ত পাই না। আজ আমি হলপ করে বলতে পারি আমার মা খুব কম দিনই দু' বেলা পেট ভরে খাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। আমাদের সকলকে দিয়ে-থুয়ে ভাঁড়ার প্রায়ই তার শূন্য হয়ে যেত। ফলে তাকে দেখেছি অনেকদিন উপোসী পেটে গেলাস গেলাস জল খেতে। কিছু প্রশ্ন করলেইতিনি বলতেন, 'শরীর খারাপ, খাওয়ার ইচ্ছে নেই।' আজ বুঝি, মারসেই না খাওয়ার ইচ্ছেটা আসলে হচ্ছে আমাদের ঘরের অভাব।

আমার বয়স তখন দশবছর। খেলার নেশা তখন আমার মগজকে কুরে কুরে খাচ্ছে। দিন রাত খেলে বেড়াচ্ছি। আমাকে খেলতে হবে, খেলোয়াড় হতে হবে—এই ছিল তখন আমার স্বপ্ন। কিন্তু খেলিটা কি করে? বল পাব কোথায়? কে দেবে আমায় একটা বল কিনে?

মাথার মধ্যে যখন এই চিন্তা, ঠিক তখন একটা ইচ্ছে নাছোড়বান্দার মতো আমাকে উদ্ব্যস্ত করে তুললো। শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম, টাকা পাই কোথায় বল কেনার জন্য। মুহূর্তে চোখের সামনে ভেসে উঠল আমাদের ছোট রেললাইন। লাইনের ধারে মটর শুঁটির খামার। ওই লাইন বরাবর মালগাড়ি চলে যায় শহরের দিকে। অধিকাংশই বাদাম চালানির মালগাড়ি। আমার জানা আছে, মালগাড়ির ঝাঁকুনিতে বাদাম অনেক সময় গড়িয়ে পড়ে মাটিতে, কখনও খোলা ওয়াগান। ব্যাপারটা মনে হতেই মন টানলো। ইচ্ছে হলো কাল সকালেই একবার চলে যাই, রেললাইনের ধারে দাঁড়ালে কিছু বাদাম তো পাওয়া যাবে। আর সেই বাদাম সিনেমা-হলের সামনে দাঁড়িয়ে বিক্রি করলেই পয়সা পাব, তা দিয়ে একটা বলের দাম নিশ্চয়ই হয়ে যাবে। যা

ভাবা তাই কাজ। আমি প্রস্তুত হলাম। পরক্ষণে আবার মনে হলো এ কি ভাবছি আমি—চুরি করছি। চুরি করা যে অন্যায়—পাপ। হঠাৎ এক পাপবোধ আমাকে দুর্বল করে দিল। আমি থমকে গেলাম। মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব। শেষ পর্যন্ত আমার ইচ্ছের জয় হলো—সিগন্যালে মালগাড়িটা দাঁড়াতেই আমি একটা দরজা খোলা ওয়াগান থেকে এক মুঠো বাদাম তুলে নিলাম আমার ব্যাগে, তারপর দে চম্পট।

সেই আমার চুরি করা।

আমি চুরি করেছি, একথা স্বীকার করতে আজ আমি লজ্জা পাই না। বরং সবাইকে আমি গর্বের সঙ্গে বলি, চুরি করেছি বলে তোমরা আমায় চোর বলতে পার কিন্তু মনে রেখ—এই চুরি আমি আমার ফুটবলের জন্য করেছি, অন্য কিছুর জন্য নয়। যে ফুটবলের জন্য আমার চুরি করা, সেই ফুটবলই আমায় পরম কৃতজ্ঞতায় পরিয়ে দিয়েছে বিশ্বের সেরা মুকুট—রাজার রাজা, ফুটবলের রাজ-মুকুট।

আমার খেলা দেখে প্রথম যদি কেউ মুগ্ধ হয়ে থাকেন, তিনি হলেন আমার বাবা। আমার বাবা, আগেই বলেছি, তিনি ছিলেন সেকালের একজন নামকরা ফুটবলার। তখনকার দিনে অনেক কৃতি খেলোয়াড়ই ছিলো তার বন্ধু—আপনজন। আর এই বন্ধুদের মধ্যে একজন হলেন ব্রিটো।

একদিন আমি খেলছি। বাবা যে কখন দূর থেকে আমার খেলাকে দেখেছেন লক্ষ্য করিনি। লক্ষ্য পড়লো অনেক পরে। তাকিয়ে দেখলাম, তিনি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। চোখ জোড়া তার স্থির, বিস্ময় ভরা। চোখের পলক পড়ে না যেন। তারপর একসময় তিনি আমাকে কাছে ডাকলেন। আমার কাঁধে-পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। আমি তো থ। বাবাকে তো এর আগে কখনও এমন চেহারায় দেখি নি। অবাক হলাম ভীষণ। ব্যাপারটা বুঝলাম দিনকয়েক পরে। আমার হাতে একটা চিঠি দিয়ে তিনি দেখা করতে বললেন ব্রিটোর সঙ্গে। ব্রিটো—সেকালের একজন নামি ফুটবলার।

মানুষটা তখন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। তার ট্রেনিং পাওয়া সকলের

ভাগ্যে জোটে না। তিনি 'বাউরু অ্যাথলেটিক' ক্লাবের ট্রেনার তখন। কত হাঁক-ডাক। বাবার চিঠি নিয়ে আমি হাজির হলাম ব্রিটোর সামনে।

আমার হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে পড়লেন তিনি। চিঠিতে বাবা লিখেছিলেন 'তুমি একদিন কথা দিয়েছিলে আমার ছেলেকে মানুষ করে তুলবে, আমি সেই ভরসাতেই তোমার কথা মতো ওকে পাঠালাম। ওকে তুমি দেখ—আমার খেলোয়াড় হতে না পারার স্বপ্নকে তুমি ওর মধ্যে দিয়ে সার্থক করে তুলো। আজ থেকে আমার নাসিমেণ্টো তোমার—তোমার নাসিমেণ্টো। মনে রেখ, ওর জীবনের সাফল্যের জন্য যেমন তুমি, ব্যর্থতার জন্যও তেমনি তুমি দায়ী থাকবে।'

ব্রিটো চিঠিটা পড়লেন। তাকালেন আমার দিকে।

প্রশ্ন করলেন—ফুটবল তোমার ভাল লাগে?

—হ্যাঁ

—তুমি ফুটবলার হতে চাও?

—হ্যাঁ

—ফুটবল তুমি খেলেছ কখনও?

—হ্যাঁ!

ঠিক আছে। আজ থেকেই তোমার ট্রেনিং শুরু।

শুরু হলো আমার জীবন সাধনার অধ্যায়। ব্রিটো অদ্ভুত ধরনের মানুষ। খুব একটা বেশী পরিশ্রম তিনি আমায় কখনও করতে দিতেন না। খুব হালকা শ্রমের মধ্যেই ছিল আমার ট্রেনিং পর্ব। ব্রিটো বলতেন, 'জোর করে পরিশ্রমের মাত্রা কারোর ওপর চাপানোর অর্থ ভাল ট্রেনিং নয়। ভাল ট্রেনিং হলো শরীর বুঝে শ্রম করতে শেখানো। আর বাচ্চাদের বেলায় খেলাকে খেলা করেই শেখাতে হয়। তাতে ভবিষ্যতে সে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারে।'

মাস কয়েক ধরে চললো ট্রেনিং-এর প্রাথমিক পর্ব। বড় মাঠে বল নিয়ে দ্রুত গতিতে ছোটার অভ্যাস চললো কিছুদিন। তারপর

পাশাপাশি দল বেঁধে বল নিয়ে দৌড়ের পালা। কিছুদিনের মধ্যেই ব্রিটো পেলেন নাসিমেণ্টোর সত্যিকার পরিচয়।

আমার জীবনে প্রথম খেলার দিনটি ছিল বড় অপ্রত্যাশিত। সেদিন 'নরোওয়েস্ট' ক্লাবের সিনিয়ার বিভাগের খেলা। খেলা মানে বড় খেলা। সবাই এসেছে এই খেলা দেখতে। মাঠের দুধারে কাতারে কাতারে উৎসাহী মানুষ। হঠাৎ পাঁচ সাত মিনিট আগে খবর এলো 'নরোওয়েস্ট' ক্লাবের একজন খেলোয়াড় অসুস্থ। খবর শুনে কর্তৃপক্ষ মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। বিনা মেঘে বজ্রপাতের সামিল হলো ব্যাপারটা। এখন কি করা যায়? কে খেলবে—কাকে খেলাবেন কর্তৃপক্ষ।

কেউ বললেন ;—কাউকে দরকার নেই। একজন কম নিয়েই মাঠে নামা হোক।'

কেউবা ফিসফিস করে বললেন, 'তা কি হয়, তার চেয়ে বরং ওই কালো ছেলেটাকে মাঠে নামাও, দেখাই যাক না।' কিন্তু তা কি করে হয়। অতটুকু ছেলে, ও তো মাঠে দাঁড়াতেই পারবে না। বয়সের তো একটা ব্যাপার আছে। আহা, দেখাই যাক না—দলে কম খেলোয়াড় নিয়ে মাঠে নামার চাইতে ওকে নামিয়ে দেখাই যাক না।

বেশ কিছুক্ষণ, কি হবে না হবে, তাই নিয়ে চললো বচসা। শেষ পর্যন্ত নাসিমেণ্টোর ডাক পড়লো। তুলে দেওয়া হলো তার হাতে জার্সি। বলা হলো, 'ওহে, ছোকরা, পারবে তো—দেখ বাবা—হিতে বিপরীত যেন কিছু করে বসো না।'

আমি কোন কথা না বলে জার্সিটা হাতে তুলে নিলাম। দেখলাম জটলার মধ্যে একধারে দাঁড়িয়ে আছেন ব্রিটো—সারা মুখে তার উজ্জ্বল হাসি। তার দু'চোখের নির্মল দৃষ্টি আমাকে যেন অভয় দিয়ে বলছে ; 'কোন ভয় নেই সাসি, তুমি মাঠে নেমে পড়। মনে রেখ, তুমি ব্রিটোর ছাত্র।'

মুহূর্তে কে যেন আমাকে শক্ত করে তুললো। আমি জার্সি গুঁজে

নেমে পড়লাম মাঠে। রেফারি তখন মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজাচ্ছেন।

খেলা শুরু হতেই আক্রমণ। মিনিট কয়েক যেতে না যেতেই একটা বল এসে পড়লো আমার পায়ে। আমি বলটা পায়ে নিয়ে একবার তাকালাম সামনের দিকে—দেখে নিলাম গোলপোস্টের সঙ্গে আমার নিজস্ব দূরত্বকে। তারপর শুরু করলাম বল পায়ে নিয়ে তীর বেগে ছোটা। এখন কে আমায় পায়। আমার নাগাল পাওয়ার সাধ্যি হলো না কারো। বল নিয়ে পেনালটি বক্সের মধ্যে ঢুকেই করলাম কোণাকুণি শট। মাটি কামড়ে বল পোস্টে ধাক্কা খেয়ে ঢুকে গেল জালে। গোল—গোল—গোল—সেই একটা গোল শুধু নয়। তারপর সেই খেলায় আমি দিলাম ন' নটা গোল—দল জিতলো মোট এগারো গোলে।

আমার খেলা দেখে সবাই থ। ছুটে এলেন ব্রিটো। কোন কথা না বলে, কেবল আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, 'মনে রেখ, এর চেয়ে আরো বড় খেলা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। আরো ভালো খেলতে হবে—এ খেলা তোমার তেমন কিছু হয় নি।'

আমি তো অবাক। বলে কি মানুষটা! এ খেলায় আমি ন' নটা গোল করলাম, তবু তিনি সন্তুষ্ট নন! থমকে গেলাম আমি।

কিন্তু দু'বছর কাটতে না কাটতেই আমি টের পেলাম মানুষটার সত্যিকার হৃদয়ের। আমার দিকে আঙুল তুলে তিনি স্যাণ্টোস দলের এক কর্মকর্তাকে বললেন—'Look that boy—this boy will be the greatest Soceer player in the world."

একেই বলে জহুরীর জহর চেনা—পাকা চোখ না হলে কেউ এমনভাবে এক নজরে বস্তুর গুণাগুণ বিচার করতে পারে না। ভবিষ্যৎ বক্তা ব্রিটোর কথা শুনে স্যাণ্টোসের সেই কর্মকর্তার চোখ তো ছানা-বড়া হওয়ার অবস্থা। এই ছেলেকে নিয়ে কিনা ব্রিটোর এত অহমিকা! ব্রিটো হয়তো তার মনোভাব বুঝেছিলেন। তাই তিনি নিজের কথাকে প্রমাণ দেবার জন্য করলেন ক্লাবের মধ্যে এক প্রীতিখেলার আয়োজন,

নিমন্ত্রণ করলেন স্যান্টোস ক্লাব কর্তৃপক্ষদের—স্বয়ং ক্লাব সভাপতি হাজির।

ব্রিটো তাদের নিয়ে মাঠের একধারে বসলেন। শুরু হলো খেলা। খেলার শুরুতেই নাসিমেণ্টো তার পায়ের যাদুতে তন্ময় করে দিল গোটা মাঠকে। যেমন বল রিসিভিং, তেমনি তার পায়ের স্কিল্। বল নিয়ে যখন সে সাপের মতো এঁকেবেঁকে ছুটে যায়, তখন কারো পক্ষে তার সেই দুরন্ত গতিকে রোধ করা সম্ভব হয় না। ব্রিটোর পাশে বসা স্যান্টোস সভাপতির চোখ জোড়া তখন নাসিমেণ্টোর পায়ের ছন্দময় যাদু চাতুর্যে তন্ময়। একি ফুটবলার—না কি যাদুকর, একি সম্ভব, এতটুকু একটা ছেলের পক্ষে গোটা মাঠকে নাস্তানাবুদ করা!

খেলা শেষ হতেই স্যান্টোস সভাপতি চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন। হাঁক মারলেন, 'ডাকো ওই ছোকরাকে। আজই আমি ওকে স্যান্টোসের জন্য অগ্রিম টাকায় চুক্তি করতে চাই। মহামান্য ট্রেনার ব্রিটোর কথাই ঠিক—এ ছেলে তো ছেলে নয়, এ যেন সাক্ষাৎ ফুটবলের যাদুকর।'

ডাক পড়লো নাসিমেণ্টোর। এসে দাঁড়ালো সে গুটিগুটি স্যান্টোস ক্লাব সভাপতির সামনে। দশ নম্বর জার্সি গায়ে ছেলেটির দিকে মুগ্ধ চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন মানুষটা, তারপর স্পষ্ট গলায় বললেন, 'আমি তোমার খেলা দেখে মুগ্ধ হয়েছি, কি তোমার নাম?' তেরো বছরের সরল কিশোর দুচোখ ভরা বিস্ময় নিয়ে তাকালো তার দিকে, বললে ভাঙা ভাঙা স্বরে নরম গলায়, 'এডসন-অ্যারেণ্টস-নাসিমেণ্টো।'

ভদ্রলোক তখনও তার মুখের দিকে একভাবে তাকিয়ে। নাসিমেণ্টো নিজের নাম বলার পর্ব শেষ করতেই তিনি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন: তুমি স্যান্টোসের হয়ে খেলতে চাও?

—স্যান্টোস! চমকে উঠলো কিশোর। এ যে স্বপ্ন! স্যান্টোস যে গোটা ব্রেজিলের এক ঐতিহ্যবাহী ফুটবল ক্লাব। সে খেলবে ওখানে কি করে, কে তাকে খেলাবে? মানুষটা কি তার সঙ্গে রসিকতা করছেন?

—কি হে বল, উত্তর দাও আমার কথার—তুমি কি স্যাণ্টোসের হয়ে খেলতে চাও না তাহলে?

এবার কিশোরটি তাকালো তার দিকে। তারপর বললে—স্যাণ্টোসের হয়ে খেলতে কে না চায়।

তাহলে রাজি।

কথাটা বলেই ভদ্রলোক করমর্দনের জন্য হাতটা বাড়িয়ে দিলেন কিশোর ফুটবলারের দিকে। পাশেই দাঁড়িয়ে সেই মহামান্য মানুষ ব্রিটো। তিনি নীরব, কেবল মুখ টিপে হাসছেন।

ভদ্রলোক বললেন নরম গলায়, 'তুমি হয়ত আমাকে চেনো না—আমি স্যাণ্টোস ক্লাবের সভাপতি। আজ আমি তোমার খেলা দেখে মুগ্ধ। আমি তোমার মতো একজনকে চাই আমার দলে।'

মানুষটার সেই কথায় কেঁপে উঠলো কিশোরের বুক। তাকালো সে গুরুর দিকে। দুচোখে বিস্ময়—একি স্বপ্ন না সত্যি? আমাকে স্যাণ্টোস দলে খেলাতে চায়! কিন্তু এত ছোট বয়সে। এখনও যে আমার শেখার অনেক কিছু বাকি আছে বলে বলেছেন ব্রিটো। তাই কিশোরটি সরাসরি বললে—আমি এখনই আপনার প্রস্তাবকে মেনে নিতে পারছি না। একটু ভাবতে দিন।

—কেন? এতে ভাবনার কি আছে?

—এখনো আমার শেখার অনেক কিছু বাকি আছে। তা ছাড়া আমার বয়স মাত্র তেরো বছর। আমাকে আরো দুবছর সময় দিন আপনি। আপনাকে কথা দিচ্ছি, পনেরো বছর বয়সে আমি ঠিক হাজির হব আপনার কাছে, অবশ্য তখন যদি আপনি আমায় চিনতে পারেন? ভদ্রলোক তাকালেন ব্রিটোর দিকে। গুরুও খুশী শিষ্যের কথায়। ভদ্রলোক বললেন—'দু'বছর পরেই আপনি ওকে পাঠাবেন না হয়। কিন্তু আজই আমি চুক্তিটা সেরে রাখতে চাই। নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে আপনার কোন আপত্তি নেই।'

—না

ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে তিনি চুক্তিপত্র এগিয়ে দিলেন, সঙ্গে কিছু

আগাম টাকাও। কলম এগিয়ে দেওয়া হলো নাসিমেণ্টোর হাতে। বলা হলো, "দু'বছর পরেই তুমি দলে যোগ দিও, কিন্তু তার আগে সইটা করে ফেল বাপু।"

কলমটা হাতে নিয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকলাম আমি। এ আমি কোথায় স্বাক্ষর করতে চলেছি। এ যে স্যাণ্টোস ক্লাবের চুক্তি পত্র —আমার জীবনের এক গোপন স্বপ্ন। চোখ ঝাপসা হয়ে এলো, চোখের ওপর ভেসে উঠলো অভাবী বাবার মুখটা। আমি যেন বড় হই, এটাই তো তার ইচ্ছে, তার হৃদয়ের আন্তরিক প্রত্যাশা। আর আমার মা, দুঃখের তিনি প্রতিমূর্তি যেন। কত শান্ত, ধীর, স্থির, সংযত। মার চোখে আমি দুঃখের দিনেও কখনো চোখের জল দেখিনি। সেই মা খবরটা শুনে নিশ্চয়ই সুখী হবেন। আমার দু'চোখের পর্দা ঝাপসা হয়ে আসে—আমি চুক্তিপত্রে কি লিখি—আমার নাম !

এক সময় টের পেলাম আমার পিঠে নরম এক হাতের ছোঁয়া। বুঝলাম এ হাতের স্পর্শ আর কারো নয়, তিনি হলেন আমার গুরু—আমার আদর্শ মহামান্য ব্রিটো। ফিসফিস করে তিনি আমায় বললেন —সইটা তাড়াতাড়ি করে দাও—আর কতক্ষণ। আমি একবার তাকালাম ব্রিটোর দিকে, তারপর কোনরকমে চুক্তিপত্রে লিখে দিলাম আমার নাম। সেই স্মৃতি আজো আমার বুক ছুঁয়ে আছে। আমি নির্জনে একা হলেই ভাবি সেই কথা—সেদিনের কথা। মনে পড়ে আমার কিশোর বয়সের দিনগুলোকে। চোখের ওপর ভেসে ওঠে বাবার উজ্জ্বল মুখ। আমি তার স্বপ্ন—সেই স্বপ্নকেই সার্থক করতে চলেছি। আর ব্রিটো—আমার তেরো বছর বয়সে যে মানুষটি প্রথম আত্মদর্পণে ভবিষ্যতের ছবি দেখে বিশ্বজনের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—"This boy will be the greatest Socecr Player in the world,"

আমি সেই মহামান্য ফুটবল ঋষি ব্রিটোর কথা রাখতে পেরেছি—সার্থক করে তুলেছি তার ভবিষ্যৎ বাণীকে। এই কথা রাখাই আমার ফুটবল জীবনের সার্বিক সার্থকতা।

কে এই পেলে

যে পেলেকে নিয়ে গোটা বিশ্বের এত মতামাতি, এত কাব্য, সেই পেলে আসলে কে ? তিনি টেসকেরাকোস গ্রামের সেই কিশোর, যার আসল নাম এডসন-অ্যারেন্টা-ডু-নাসিমেন্টো। যাকে মা আদর করে ডাকতেন 'সাসি' বলে। এই প্রশ্ন শুধু একা আমাদের নয়, স্বয়ং পেলের'ও। তিনি নিজেও জানেন না তিনি কিভাবে একদিন আসল নামের খোলস ছেড়ে আন্তর্জাতিক আসরে চমক এনে দিয়েছেন 'পেলে' নামে। এই নাম তাকে কে দিল ? এই নাম তার কার দেওয়া। আশ্চর্য ! এই চিন্তা সময়-সময় মানুষটাকে ভীষণ ভাবে ভাবিয়ে তোলে। বাবা মার দেওয়া নাম আজ প্রায় বিশ্বের মানুষ ভুলে গেছে, তারা তাকে দিয়েছে এক নতুন নাম। এই ছদ্ম নামের আড়ালে দাঁড়িয়ে নিজেকে তার বড় অপরাধী বলে মনে হয় তার বাবা মার কাছে। কি কৈফিয়ৎ তিনি দেবেন। এ যে সব পাওয়ার পরেও এক মর্মান্তিক বেদনা, আত্মদহন। তবু এত দহনের মধ্যেও তার ভাল লাগে এই শব্দ দুটি—'পেলে'। ওই নাম শুনলেই 'সাসি'র বুকের রক্তে দোলা লাগে। মনে হয় ফুটবল যেন তাকে চোখের ইশারায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে, কাছে পেতে চাইছে তাকে। মন তার দুলে ওঠে। নিজেকে আর তাই স্থির রাখতে পারেন না। ছুটে যান বল নিয়ে এক গোল থেকে অন্য গোলে। কে তাকে রুখবে, কে তাকে বাধা দেবে। পেলে নামের মধ্যেই যে লুকিয়ে আছে ফুটবলের আসল ঐশ্বর্য আকর।

নিজের এই জনপ্রিয় নামটাকে নিয়ে মানুষটা অনেক ভেবেছেন।

'পেলে' আসল উচ্চারণ হলো 'পেলেদা'। 'পেলেদা' আসলে পোর্তুগীজ শব্দ, যার অর্থ হলো, বল নিয়ে ফুটবল খেলা। এডসন যখন ছোট, তখন থেকেই সে খেলা পাগল। ফুটবলের প্রেমে সে মাতোয়ারা। ফুটবল প্রিয় এই কিশোরটিকে তাই বন্ধুরা আদর

করে ডাকতো 'দোনা ছ্যায় বোলা পারা অ্যানস্‌সা পেলেদা'। অর্থাৎ আমাদের খেলার আসরে বলের মালিক যে—সেই—'পেলেদা।'

বন্ধুদের তামাশার 'পেলেদা' আজ 'পেলে'। আগে আগে সবাই বলতো 'দোনা ছ্যা পেলেদা,' পরে এই নাম সংক্ষেপ করে রাখা হয়, 'পেলেদা' এবং আরো পরে সেই কিশোর যখন জনপ্রিয়তার শিখর ছুঁতে চলেছে, তখন থেকেই তার এই নাম চলে আসছে ফুটবলে। ফুটবল যতদিন থাকবে ততোদিন বেঁচে থাকবেন 'পেলে'। 'এডসন-অ্যারেণ্টস-ডু-নাসিমেণ্টোর হয়ত কোন পুণ্য প্রভাতে জীবন-দীপ নিভে যেতে পারে। কারণ তিনি মানুষ, মানুষ বলেই জীবনের সত্যতা বিচারে মৃত্যুর কষ্টি বিচার। কিন্তু 'পেলে' অমর—মৃত্যুঞ্জয়। তিনি অমৃতময় ফুটবলের মানসপুত্র। তাই ফুটবল যতদিন থাকবে, যতদিন মানুষ বেঁচে থাকবে এই পৃথিবীতে, ফুটবল নিয়ে চলবে বোঝাপড়া, ততোদিন নিজের আসনে অম্লান থাকবেন ফুটবলের মহানায়ক, রাজার রাজা—'পেলে'।

পেলের সেরা গোল

পেলের জীবনে সেরা গোল কোনটি ?

হঠাৎ এই প্রশ্ন আজো থমকে দেয় ফুটবল প্রেমিক মানুষকে। পেলের সেরা গোল—তাইতো—পেলের সেরা গোল কোনটি ? কে উত্তর দেবে এই সহজ প্রশ্নের। সাংবাদিকেরা বিব্রত। বিব্রত স্বয়ং পেলেও। কি উত্তর আছে এই প্রশ্নের। এ তো সহজ প্রশ্ন নয়। মানুষটা যে তার ফুটবল জীবনে এক-আধটা গোল নয়, দিয়েছেন হাজার'টা গোল। আর তার এই হাজার গোলের মধ্যে প্রতিটি গোলকেই বার বার মনে হয়েছে, এটাই দর্শনীয়। হয়ত সেই কারণে এক ব্রেজিলিয়ান সাংবাদিক রসিকতা করে এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে

বলেছিলেন, 'পেলের সর্বশেষ গোলটি হলো দর্শনীয়, যে গোলটি এখনো তার দেওয়া হয় নি।'

প্রশ্ন করা হয়েছে সংবাদিকদের ছেড়ে স্বয়ং পেলেকে ; 'অপনি বলুন, আপনার সেরা গোল কোন্‌টি ?'

আমি ! একটু থমকে গিয়েছেন পেলে। তারপর কালো সরল মুখে এক গাল ঝলমলে হাসি ছড়িয়ে বলেছেন ; 'এ-প্রশ্নের উত্তর আমি দিই কি করে বলুন তো। আমি প্রতিটি গোলকেই আমার সন্তানের মতো ভালোবাসি, আমার পক্ষে তাই চট করে এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করা ঠিক নয়। আর তা ছাড়া একটা গোল দেবার পর আমি আর সেই গোলের জন্য চিন্তা করি না। আমি মনে করি গোল দেবার দায়িত্ব আমার, আর তার চেয়েও বড় দায়িত্ব হলো দলকে জেতানো। কাজেই মন থাকে আমার খেলা জেতার দিকে, গোলের হিসাব রাখতে বা দর্শনীয়তা বিচারের দিকে নয়। এর জন্য সমালোচকেরা আছেন, আছেন সমর্থকেরা, তারাই বলে দেবেন কোন্‌টি আমার সেরা গোল।'

এক পেলে, গোল দিয়েছেন হাজারটা—তিনি কি মানুষ ! সে তো ফুটবলের দেবতা। গোটা ফুটবলের প্রতীক। তার সেরা গোলের বিচার করার দায়িত্ব কি এত সহজ।

পিটার লরেঞ্জো, বিশ্বকাপ ফাইন্যালে সুইডেনের বিরুদ্ধে পেলেকে গোল করতে দেখে, প্রেসবক্সে বসে চিৎকার করে উঠেছিলেন— 'এ্যামেজিং, রিয়েলী এ্যামেজিং', ওকি দেবতা—এমন গোল সে করলো কি করে ! পিটার লরেঞ্জোকে তাই প্রশ্ন করলে, তিনি এক বাক্যে বলেন, 'পেলের সেরা গোল বিশ্বকাপ ফাইনালে আমি দেখেছি। রোজাণ্ডা স্টেডিয়াম পেলের সেদিনের রাজকীয় সেই গোলের রাজসাক্ষী। আমি আজো ভাবতে পারি না, একজন ফুটবলারের পক্ষে এমন একটা অভাবনীয় গোল করা কি করে সম্ভব হলো, যা অসম্ভব তাকেই সম্ভব করে তোলাই হচ্ছে পেলের সহজ প্রকাশভঙ্গি। এখানেই তিনি মহৎ, সবার সেরা—রাজার রাজা।

পেলের সেরা গোলের যে প্রশ্ন উঠেছে, তার সহজ উত্তর আজো দেওয়া সম্ভব হয় নি কারো। ঘন ঘন প্রশ্নটি নিয়ে সমালোচক মহলে উঠেছে তর্ক-বিতর্ক। পিটার লরেঞ্জো এক বলেন তো, অন্যজন আর একটা গোলের কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

সে বছর চিলিতে বসেছে বিশ্বকাপের আসর। প্রথমেই মূল লীগের খেলা। ব্রেজিলকে খেলতে হবে দক্ষিণ আমেরিকার বেনফিকা দলের সঙ্গে। বেনফিকা খুব একটা কমজোরী দল নয়। ওদের দলও বেশ উচ্চাঙ্গের। ফলে ১১ই অক্টোবর এই খেলাকে ঘিরে চললো চারদিকে সাজ সাজ রব। একদিকে স্যাণ্টোস, অন্যদিকে বেনফিকা। মনোরম লাজ স্টেডিয়াম। চারদিকে আলোয় ঝলমল করছে। লোক আর লোক—দর্শকের সমারোহ। সেদিনের খেলায় এক অসামান্য ভূমিকা নিলেন পেলে, তার পাশে চিরকালের সঙ্গী' গ্যারিঞ্চা। গ্যারিঞ্চাও একজন বড় ফুটবলার। তার পায়ের যাদুও মনোমুগ্ধকর, সেই সঙ্গে দুরন্ত শটের ওজন, যা প্রতিরোধ করা সময় সময় অসাধ্য। খেলা শুরু হতেই বল পড়লো গ্যারিঞ্চার পায়ে। গ্যারিঞ্চা বল ঠেলে দিল পেলেকে। বল পায়ে নিয়েই পেলে ছুটলেন বিপক্ষ গোল সীমানার দিকে। সামনে বেনফিকার এক খেলোয়াড় পড়তেই পেলে পায়ের বল ঠেলে দিলেন ভাবাকে। ভাবা ভিতরে ঢুকে চকিতে আবার সেই বল ঠেলে দিলেন আউটে। আর ততোক্ষণে পেলে জায়গা বদল করে ধরে নিলেন সেই বল। তারপর তীর বেগে টাচ লাইন ধরে তিনি ছুটে চললেন। গোটা মাঠ ডুবে গেল চীৎকারে। দুরন্ত পেলে চলতি বলে করলেন চকিতে দর্শনীয় শট। বল বাতাসে বাঁক নিয়ে সোজা ঢুকে গেল গোলে। এ-ও তো গোল—এ গোল তো দেখেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ, আবার দেখেছে নিজের সেণ্টার করা বলে পেলেকে ছুটে এসে সেই পড়ন্ত বলে হেড করে গোল করতে। তাহলে কোনটি—কোন্‌টি তার সেরা ?

এই প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক টি. ভি. সংস্থা পেলের একটা গোলকে সেরা হিসাবে নিজেদের বিচারে চিহ্নিত করেছেন। যে গোল দৃশ্যের ফ্লিমের দাম উঠেছিল বলে শোনা যায় বারো লক্ষ টাকা।

এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ভিলা ডেলমারা স্টেডিয়ামে। ব্রেজিলের বিরুদ্ধে পুললীগের প্রথম খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে মাঠে নামলো মেক্সিকো দল। গোটা স্টেডিয়াম কানায় কানায় ভরা। খেলার শুরুতেই মেক্সিকো দল টুঁটি টিপে ধরলো ব্রেজিলের। ঘন ঘন শুরু হলো আক্রমণ। এই খেলায় অসাধারণ খেলা খেললেন জেজিমা। গোটা ব্রেজিল তখন আত্মরক্ষায় নেমে এসেছে। এক সময় ডিডি বল ঠেলে দিলেন ভাবাকে। ভাবা থেকে পেলে। বল যখন পেলের পায়ে এলো তখন তিনি প্রায় নিজের পেনালটি সীমানার মধ্যে দাঁড়িয়ে। বল পায়ে নিয়ে খানিক থমকে দাঁড়ালেন পেলে। ক্ষিপ্ত সর্পের মতো দুলে উঠলো তার শরীর। গোটা শরীরটা তখন ফুলে ফেঁপে উঠেছে। পায়ে বল নিয়ে তিনি চকিতে ছুটতে শুরু করলেন। কি সে ক্ষিপ্ত গতি, এ গতি যেন অপ্রতিরোধ্য। কে তাকে বাধা দেবে। একে একে তার সামনে থেকে সরে গেলেন বিপক্ষের খেলোয়াড়েরা ; এক-দুই করে তিনি টপকে গেলেন সাত-সাত জনকে। প্রতিবারেই একেকটা নতুন কৌশল, নতুন কায়দায় বল নিয়ে ছোটার ভঙ্গি। গোটা মাঠের মানুষ মুগ্ধ—বিমুঢ়। সবাই দেখছে—একি, একি খেলা ? এক যাদুকর যেন বল পায়ে নিয়ে সকলকে মোহনী মন্ত্রে সম্মোহিত করে রেখেছে। সবাই লক্ষ্য করছে তাকে। শেষ পর্যন্ত বল নিয়ে তিনি সোজা চলে এলেন মেক্সিকো দলের গোলরক্ষকের সামনে। সে বেচারী তখন একা—অসহায়। অসহায় গোলরক্ষককে কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত পেলে বল নিয়ে সোজা ঢুকে গেলেন গোলের মধ্যে।

গোটা মাঠ চিৎকারে ডুবে গেল। সবাই স্তব্ধ, বিহ্বল, বিমূঢ়—এ গোলকে তারিফ করার মতো কোন ভাষা নেই। এ যে আশ্চর্য ইন্দ্রজালের এক মহিমময় প্রসাদ গুণ। এ গোল এক পেলের পক্ষে দেওয়াই সম্ভব। সে যে ফুটবলের রাজা—রাজার রাজা।

নিজের গোল থেকে বল নিয়ে বিপক্ষ দলের গোলের মধ্যে প্রবেশ করতে তার সময় লেগেছিল মাত্র পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ড। আর এই

পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ডের মধ্যে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় সাত সাতজন খেলোয়াড়কে তিনি অতিক্রম করেছিলেন—একি ভাবা যায়।

আসলে একজন ফুটবলার যা ভাবতে পারেন না, যা তাদের কাছে অকল্পনীয়,—তাই পেলের কাছে সহজসাধ্য। এক কথায় বলতে হয়, 'যেখানে একজন দক্ষ ফুটবলারের শেষ, সেখানেই অভাবনীয় পেলের শুরু।' তাই সে সেরা-সবার সেরা। ফুটবলের রাজা।

রাজা যায় বনবাসে

আলো আর আলোর। চারদিক ঘিরে আলোর বন্যা যেন। আকাশের বুক জুড়ে রঙিন আলোর বাজি খেলা। আলোর ফুলকি বৃষ্টি ধারার মতো ঝরে যাচ্ছে সবুজ অঙিনায়। এত সাজ, এত আলো, এত বাজি কেন ? কার জন্য এত সাজের সমারোহ আজ ! ঝলমল করছে আলোর মধ্যে রঙিন সামিয়ানা—সামিয়ানার নীচে দাঁড়িয়ে আছেন অসংখ্য বেদনাহত মানুষ-জন। আজ তারা স্তব্ধ—বেদনামগ্ন, শোকাহত। কারো মুখে কোন কথা নেই। প্রত্যেকের চোখের কোলে দুঃখের মায়াময় প্রলেপ টলমল করছে। এত সাজ, এত আলো, এত সমারোহ, অথচ তারি মধ্যে কেন ঝরে নিঃশব্দে এই অশ্রুপাত ? এই অশ্রু কেন—কার জন্য ! এত আনন্দের আড়ালে কি তবে কোন বেদনা অপেক্ষা করে আছে ? কিসের এই বেদনা ? বাতাসে বাতাস কাঁপিয়ে প্রশ্নের গভীরে ভেসে আসে প্রতিধ্বনি—'রাজা চলে যায়—রাজা যায় বনবাসে।'

জীবনের এই চলে যাওয়ার মুহূর্ত বড় করুণ। বড় কঠিন। যে যায় সেই বোঝে—এই বিচ্ছেদ মুহূর্তের আন্তরিক বেদনাকে। এ বেদনা নির্মম তীক্ষ্ণতায় বিঁধে যায় হৃদয়ে, ঝরে যায় নিঃশব্দে রক্তপাত। যে যায় সে যায়, সে তো আর ফিরে আসে না। তাই বুঝি চলে যাওয়ার মুহূর্তে মানুষ তাকে বার বার মায়াময় সুরে পিছু ডাকে। মনে করিয়ে

দেয় অতীতের স্মৃতি যা সামনে এসে পথ আড়াল করে বলতে চায়, 'যেতে নাহি দিব।' কিন্তু হায়রে, যে যাওয়ার তাকে যেতে দিতেই হয়, দিতে হয় পথ করে, কারণ জীবনের সত্যতা বিচার এই চলে যাওয়াই হলো আসল সত্যি।

১৯৭৪। ২রা অক্টোবর। বুধবার। খেলার এক আসর বসেছে ভিলা ডেলমারা স্টেডিয়ামে। আলো আর আলো, আলোর ঝরকায় ঝলমল করছে চারধার। রঙিন আলোর নিচে বর্ণালী সামিয়ানা। বাতাস কাঁপিয়ে পতপত করে উড়ছে পতাকা। মাঠের চারদিকে অথৈ বন্যা মানুষ জন। মানুষ আর মানুষ। গোটা ব্রেজিল যেন উজাড় করে এসেছে আজ ভিলা-ডেল-মারায়।

রেফারি বাঁশি বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো খেলা। একদিকে সাদা কালো ডোরা-কাটা জার্সি পরনে চিরপরিচিত সেই স্যাণ্টোস দল, অন্যদিকে পন্‌টিপ্রিটা দলের খেলোয়াড়েরা। মাঠের অগণিত মানুষ আজ উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে আছে একটি মানুষের দিকে। ব্যাকুল হয়ে প্রতীক্ষা করছে সেই মুহূর্তটির জন্য। সেই মুহূর্ত ফুটবলের এক চরম মুহূর্ত, এই চরম মুহূর্তের মধ্যে বিদায় নেবেন ফুটবলের চিরপরিচিত রাজা। খেলা চলছিল, বাড়ছিল গতি। বল দেওয়া-নেওয়া করে বিপক্ষের গোলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল স্যাণ্টোস দলের আক্রমণ-কারীরা। হঠাৎ ২১ মিনিটের মাথায় সেই চলার মধ্যে ঘটল ছন্দপতন। থমকে গেলেন রাজা, চমকে উঠলো ভিলা ডেলমারার অগণিত মানুষ সবাই স্তব্ধ—বিহ্বল। আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন দর্শকেরা। তারা সবাই নীরব। হৃদয়ের অন্তরালে তখন তাদের বেজে চলেছে ব্যথার নূপুর। খেলোয়াড়েরা দাঁড়িয়ে পড়লেন যে যার নিজের জায়গায়। সকলের অশ্রু-আপ্লুত চোখ তখন তার দিকে। দীর্ঘকায় মানুষটি ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালেন মাঠের মাঝখানে। তারপর বসে পড়লেন নতজানুর ভঙ্গিমায়। দু-চোখের কোলে তার অশ্রু টলমল করছে, কণ্ঠস্বর আবেগভরা। কোন কথা বলতে পারলেন না। কেবল হাত-জোড় করে নতজানু ভঙ্গিমায় তাকালেন প্রত্যেকের দিকে। চোখের

কোল ঘিরে নদীর ধারার মতো অশ্রু তীর বেগে নেমে এলো দু' গালের ঢাল বেয়ে। অস্ফুট স্বর শোনা গেল রাজার কণ্ঠে! কিছু তিনি বলতে চাইছেন। সবাই নীরব। কি বলবেন তাদের রাজা। রাজা তাকালেন। অশ্রু যেন বাঁধ মানতে চাইছে না। তবু তিনি বললেন; 'আমাকে আপনারা ক্ষমা করুন। আমাকে বিদায় দিন। হে ফুটবল, আমার প্রিয় ফুটবল—বিদায় চির বিদায়।'

কথাটা শেষ করেই রাজা হাতে তুলে নিলেন বলটা। জড়িয়ে ধরলেন বুকে, চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন করে, অশ্রু সিক্ত গলায় বললেন, 'তুমি আমায় অনেক দিয়েছ। দিয়েছ সম্মান, ঐশ্বর্য, মানুষের ভালবাসা। আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ, চিরকৃতজ্ঞ—আমি আমার যাবতীয় অহং-কারকে আজ তাই তোমার কাছেই রেখে যাই। আমাকে তুমি দাও, ফিরিয়ে নাও তোমার ঐশ্বর্য—তোমার দেওয়া শক্তি। আমি যে নিঃস্ব ছিলাম, সেই নিস্বঃতার মধ্যেই আজ আমি ফিরে যেতে চাই।'

কথাগুলো বলতে বলতে কণ্ঠস্বর তার ধরে এলো। দু' চোখের কোল ভেসে গেল অশ্রুতে। গড়িয়ে পড়লো সবুজ ভূমির বুকে দু' এক ফোঁটা বেদনাশ্রু। অমৃতময় হয়ে উঠলো ভিলা ডেলমারার সবুজ নিকেতন। তারপর ধীরে ধীরে তিনি দু' হাত তুলে অভিবাদন জানালেন দর্শকদের। এতদিন এই দর্শকেরাই তো তাকে হৃদয়ের মণিকোঠায় স্নেহের দুলাল করে সাজিয়ে রেখেছিল। চারদিক থেকে চিৎকার উঠলো 'হে রাজা, তোমাকে আমরা ভুলবো না, তুমি আমাদের চিরকালের রাজা—চিরদিনের।'

আবেগমাখা গলায় মানুষটা আবার বলতে শুরু করলেন, 'আঠার বছরে ফুটবল জীবনে আমি হয়ত আপনাদের কাছে অনেক অপরাধ করেছি, অনেক অন্যার করেছি, আজ এই বিদায়ের মুহূর্তে আমাকে আপনারা মনে রাখবেন এই অমার অনুরোধ।' আবেগজড়িত কণ্ঠস্বরের শেষটুকু শোনা গেল না। ঠোঁটজোড়া তার বাঁশপাতার মতো তির-তির করে কাঁপছিল। ধীরে ধীরে মানুষটা এবার উঠে দাঁড়ালেন। তাকালেন খেলোয়াড়দের দিকে। চোখভরা জল, বুকভরা ব্যথা। মন

চায় না, তবু যেতে হবে, যেতে হবে মহানায়ককে, পথ করে দিতে হবে মহাপথিককে মহাপ্রস্থানের যাত্রায়। মানুষটা আস্তে আস্তে তার গা থেকে খুলে ফেললেন স্যাণ্টোস দলের প্রিয় সেই দশ নম্বর জার্সি। তারপর ডানহাতে সেই জার্সিটাকে পতাকার মতো বাতাসে উড্ডীন করে ছুটতে লাগলেন মাঠের কিনারা ধরে। আগে রাজা, পিছনে পিছনে ছুটে চলেছেন স্যাণ্টোস আর পনটিপ্রিটা দলের খেলোয়াড়েরা। ওদের লক্ষ্য করে লাইনের ধার ঘেঁষে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছে ট্রলি ক্যামেরা। ক্লিক···ক্লিক ফ্ল্যাশগান ঝলসে দিলো মাঠের চারদিক। উদ্বেল জনতা উঠে দাঁড়িয়ে রাজাকে বিদায় অভিবাদন জানাতে থাকেন। বেড়ার ধার থেকে বৃষ্টির মতো ঝরতে থাকে তাজা ফুল। মাথার উপর পুষ্পক রথের মতো ঘুরতে থাকে হেলিকপটার, ফুলের বৃষ্টি যেন। সারা মাঠ ভরে যায় ফুলের বর্ষণে। রঙবেরঙের আলোয় রূপসী ভিলা ডেলমারার সবুজ অন্তর তখন কানায় কানায় ভরা। এ বিদায় কি মধুর—অথচ কি কঠিন। বুক ভেঙে যায়। গোটা মাঠ পরিক্রম শেষ করে ফুটবলের রাজা আবার এসে দাঁড়ালেন মাঠের মাঝখানে। শেষবারের মতো তিনি চুম্বন করলেন তার হাতের দশ নম্বর জার্সি, তুলে নিলেন মাথায়—তারপর চোখের পলকে একছুটে বেরিয়ে গেলেন মাঠের বাইরে। দু'ধারে অসংখ্য মানুষ, রাজবাহিনী, তার মধ্যে দিয়ে মানুষটা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন···মিলিয়ে গেলেন চোখের তারায়। গোটা মাঠ স্তব্ধ—বিস্ময়ে নিশ্চল। কারো মুখে কোন কথা নেই, কেবল বাতাস ছাপিয়ে ব্যথার রাগিণী বেজে যায় একটানা, বলে দেয় 'রাজা যায়, রাজা চলে যায় বনবাসে।' ফুটবলকে কাঁদিয়ে ফুটবলের রাজা চলে গেলেন। আবার শুরু হলো খেলা। বারো নম্বর জার্সি গায়ে দিয়ে মাঠে খেলতে নামলেন বদলি খেলোয়াড়। এই দিনই স্যাণ্টোস দলের সভাপতি বেদনামাখা গলায় ঘোষণা করলেন এক মহা ঘোষণা। বাতিল করে দিলেন স্যাণ্টোস দল থেকে দশ নম্বর জার্সি পরে খেলার বিধান। দশ নম্বর জার্সির সত্যিকার যে দখলদার, সেই যখন মাঠে আর থাকবে না, তখন আর

ওই দশ নম্বর জার্সি আজ থেকে স্যান্টোস বাতিল করে দিল। দশ নম্বর জার্সি গায়ে দিয়ে আর কাউকে স্যান্টোস দল মাঠে নামতে দেবে না। দশ নম্বর জার্সি মানেই পেলে, পেলে মানেই দশ নম্বর। এই দশ নম্বর জার্সি গায়ে দিয়ে মানুষটা ফুটবলে দিয়েছেন হাজারটির ওপর গোল—যা একজন ফুটবলারের পক্ষে শুধু অভাবনীয় নয়, অকল্পনীয়ও বটে। এই হাজার গোলের রেকর্ড মনে হয় আর কেউ কোনদিন ছুঁতে পারবে না। আর যদিও বা কেউ পারে তাতে হয়ত সময় লাগবে একটা ফুটবলারের পক্ষে গোটা জীবন।

স্মৃতি বড় বেদনার। নতুন করে মনে পড়ে যার আবার পুরানো সেই দিনকে। পুরানো সেই দিনের কথা, কত সুখ, কত আনন্দ—কত ভালোবাসা। একদিন আমি ছিলাম, তোমাদেরই ছিলাম।

এর পরও ব্রেজিলের জতীয় দল বিশ্বকাপে অংশ নেবে, স্যান্টোস জিতবে একের পর একটা খেলায়—আর সেই জয়ের আনন্দে, তোমরা ধীরে ধীরে ভুলে যাবে আমাকে—হারিয়ে যাব আমি বিস্মৃতির গভীর গহনে। তোমাদের রাজা আজকের পেলে—সেই কালো কিশোর নাসিমণ্টো'কে কি তোমরা আর মনে রাখবে তখন ? তখন তোমাদের সামনে অন্য কেউ, অন্য কোন পেলে মুগ্ধ করে রাখবে তোমাদের, আর সেই স্থবির স্মৃতির আড়াল থেকে তোমরা কি তখন শুনতে পাবে আমার কণ্ঠস্বর—'হে অতীত কথা কও, কথা কও।'

ফুটবল রণাঙ্গনের নায়কেরা

ফুটবল পৃথিবীর জনপ্রিয় খেলা। এই ফুটবলের রণাঙ্গনে একাল যাবৎ বহু ফুটবলার এসেছেন। কেউ আজও আছেন, কেউবা নেই। আসলে যে থাকে, সে থাকার জন্যেই থাকে। এই থাকার পিছনে আছে সেই সব মহান নায়কদের নিরলস পরিশ্রম। পরিশ্রম ব্যতীত বড় হওয়া

যায় না। অর্থাৎ "Practice—more practice makes perfect" অনুশীলন আর অনুশীলন, এই অনুশীলন প্রবণতাই একদিন তোমাকে বড় করে তুলবে। এখন প্রশ্ন ফুটবলের রণাঙ্গনে এসেছেন তো অনেকে। খেলেছেন প্রায় একাল যাবৎ লক্ষ ফুটবলার, তাদের মধ্যে কজন হয়ে উঠেছেন বৈশিষ্ট্যের আলেখ্যে একজন সার্বিক ফুটবলার?

একজন খাঁটি ফুটবলার হওয়া সহজ নয়। ফুটবলার হতে গেলে তাই বিশিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার, যে বিশিষ্ট কালজয়ী করে রাখে ফুটবলারদের। ভাল খেলার সঙ্গে দরকার, খেলোয়াড়ের সংজ্ঞানুযায়ী শিষ্টাচার, ন্যায়ানুগত্যতা, শোভন সামাজিকতা, বদান্যতা এবং সর্বোপরি মানবতা। বৈশিষ্ট্যের এই গুণাগুণের পরীক্ষায় যারা শেষ পর্যন্ত টিঁকে থাকেন—তারাই হতে পারেন সত্যিকারে কালজয়ী ফুটবলার। প্রতিভা শিক্ষা নিরপেক্ষ নয়। শিক্ষা ব্যতিরেকে কোন প্রতিভাই বিকশিত হতে পারে না। আর সেই কারণেই লক্ষ লক্ষ ফুটবলারের মধ্যে সত্যিকার ফুটবলার হিসাবে ফুটবল রণাঙ্গনে টিঁকে আছেন মাত্র কয়েকজন। শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে, বৈশিষ্টের গুণাগুণে তাই নাম করা যায় হাঙ্গেরীর ফেরেঙ্ক পুস্‌কাস, ফুটবলের যাদুকর স্যার স্ট্যানলী ম্যাথুজ, পোর্তু-গালে কৃষ্ণ শাবক ইউসোবিও, ফুটবলের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ইয়াসিন এবং সবশেষে ব্রেজিলের কালোরাজা ফুটবলের দুলাল পেলের।

বৈশিষ্ট্যের গুণাগুণ বিচারে বলা যায়, এই পঞ্চপ্রদীপ এক ছাঁচেই গড়া—একই ফুটবলের প্রেরণায়, দধীচির একই অস্থিতে গড়া বিশ্ব ফুটবলের এই পঞ্চবাণ।

পুস্‌কাস, যার নাম একদা ফুটবল প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করেছে, সেই তিনি ছিলেন ফুটবল প্রেমিক। ফুটবলের ভালোবাসায় তিনি কাটিয়ে গেছেন তাঁর দীর্ঘজীবন।

একথা স্ট্যানলী ম্যাথুজ, ইয়াসিন, পেলে'র পক্ষেও প্রযোজ্য। আজও তারা ফুটবলকে ভালোবাসেন, ফুটবলের জন্য ভাবেন, চিন্তা করেন তার সার্বিক উন্নতির জন্য।

পুস্‌কাসের প্রথম শিক্ষা গুরু ছিলেন তার বাবা। বাবার হাতেই

পুস্‌কাস মানুষ। বাবার খেলা দেখেই তিনি একদিন বড় হয়েছেন। তার বাবারও কিন্তু প্রথমটায় ছেলের প্রতি খুব একটা আগ্রহ ছিল না। তিনি চান নি, তাঁর ছেলেও তার মতো ফুটবলার হোক। ফুটবলারের জীবন যে বড় দুঃখের। কে এই দুঃখকে স্বেচ্ছায় পিতা হয়ে চাপিয়ে দিতে চায় সন্তানের কাঁধের ওপর। কিন্তু হায়রে ভাগ্য—নিষ্ঠুর নিয়তি যে তখন পুস্‌কাসকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। তাই শেষ পর্যন্ত তার বাবার পক্ষে সম্ভব হলো না, ছেলের অদম্য গতিকে প্রতিরোধ করার। পথ ছেড়ে দিলেন তিনি ভবিষ্যৎ ফুটবলারের জন্য, ফুটবলের প্রেরণায়। এরপর এমন হলো—পুস্‌কাস মাঠে গেলে বাবা তার সঙ্গে থাকেন, পাশে শিক্ষাগুরু ন্যাণ্ডুর জাকস্। পুস্‌কাস আহত হলে বাবা রাত জেগে তার পা মালিশ করে দেন, ঠিক যেমনটি ঘটেছিল ইউসোবিও'র মায়ের বেলায়। ইউসোবিও বাল্য বয়সেই পিতৃহারা। মা শ্রীমতী সিলভা ছিলেন তার জীবনের প্রেরণা। ছেলের মাথার কাছে জেগে প্রতি মুহূর্তে তিনি কপালে হাত রেখে বলতেন: 'তোকে বড় হতে হবে।'

কম সেবা কি করেছেন সিলভা ছেলেকে। ছেলে আহত হয়ে মাঠ থেকে বাড়ি ফিরলে, তার বুকের পাঁজর যেন ভেঙে যেত। সারারাত জেগে চলতো সেবা। মায়ের কল্যাণ করস্পর্শে ইউসোবিও ভুলে যেত তার শরীরে আঘাত লাগার কথা। দুঃখী মায়ের দিকে তাকিয়ে তার মনে হতো, তাকে বড় হতে হবে। পরে এই ইউসোবিওকে পুরোদস্তুর মানুষ করে তুললেন বেনফিকা দলের ম্যানেজার বেলাগুটম্যান। ইউসোবিও যেন গুটম্যানের চোখের স্বপ্ন। যেমন একদিন স্বপ্ন দেখেছিলেন ফুটবলের ঋষি ব্রিটো। এই ঋষির দিব্য চোখে উদ্ভাসিত হয়েছিলেন ভবিষ্যৎ ফুটবলের রাজা—'পেলে'। একদিকে বাবার প্রেরণা অন্যদিকে শিক্ষাগুরু ব্রিটো—তাদের যৌথ স্বপ্নের মানসপুত্র ফুটবলের সম্রাট পেলে।

পুস্‌কাসের মতো পেলের বাবাও ছিলেন একজন ফুটবলার। তিনি প্রথমটায় চান নি তার ছেলে একজন ফুটবলার হয়ে উঠুক। কিন্তু

ভাগ্যের গতি পুস্‌কাসের মতো 'পেলেকেও নিয়ে গিয়েছিল ফুটবলের দিকে। শেষে বাবার সাহচর্যে খুঁজে পেয়েছিলেন প্রকৃত শিক্ষাগুরু।

জন্মের পরেই পায়ে পায়ে ফুটবল নিয়ে এসেছিলেন স্ট্যানলী ম্যাথুজ। ছেলেবেলায় বল তাকে কে কিনে দেবে। তাই তিনি রাস্তায় পড়ে থাকা ইটের টুকরোকে ফুটবল বানিয়ে বুটের ডগায় নাচাতেন। সে এক আনন্দের দিন গিয়েছে, ঠিক যেমনি কাগজের বল দিয়ে ফুটবল খেলে আনন্দ পেয়েছেন পেলে। পায়ে পায়ে এই ইটের টুকরো একদিন তাকে অনুশীলনের মাধ্যমে গড়ে দিয়েছে সকলের অজান্তে সেরা ফুটবলার, যে ফুটবল দেখে বিস্ময়ভরা চোখে হাঙ্গেরী অধিনায়ক পুস্‌কাস আবেগভরা গলায় বলেছেন—"Methew is the most wonderful out side right, I have ever seen···He is example for all footballers"···ম্যাথুজের নিজের কথায়, 'আমি ফুটবলের ভৃত্য, সে আমায় যেমন আদেশ করে, আমি তেমনি খেলি।'

পেলের উক্তিও এ ব্যাপারে কম নয়। তিনিও খেলার প্রসঙ্গে বলেছেন ; আমি কি খেলি, ফুটবল আমাকে দিয়ে খেলিয়ে নেয়, আমি যে তার অনুগামী মাত্র।'

ভালো খেলোয়াড় হতে চাওতো ভাল খেলা দেখ। ভালো খেলা দেখে অনুশীলন কর—অনুশীলনের মধ্যেই গড়ে উঠবে তোমার সত্যিকার স্বকীয়তা। এই ভাল খেলা দেখার জন্য, খেলা দেখে বল কিনে খেলা শেখার জন্য পেলে চুরি করা বাদাম বিক্রির পয়সাকে কাজে লাগিয়েছিলেন। আর পুস্‌কাস, তিনিও তো বিক্রি করে দিয়েছিলেন তার মায়ের পোষা প্রিয় বেড়াল ছানাকে। শুধু কি তাই, বড় খেলা দেখার জন্য কি পরিশ্রমই না করেছেন মানুষটা। মাঠের পাশেই ছিল কবরখানার দেয়াল। গোপনে কিশোর পুস্‌কাস ছেনি দিয়ে পাকা চোরের মতো সুড়ঙ্গ কেটে মাঠ সংলগ্ন সেই দেয়াল ফুটো করে খেলা দেখেছেন। এত পরিশ্রম শুধু তার খেলা দেখার জন্যই ছিল। আর একবারের কথা উল্লেখ করি, সেদিন বড় মাঠে দারুণ একটা খেলা। টিকিটের তখন হাঁকাহাঁকি ডাক চলেছে বাজারে। পুস্‌কাস কিন্তু টিকিট

সংগ্রহের ধার দিয়েও গেলেন না। তিনি গাছের মাথায় উঠে, গেটকীপারকে ফাঁকি দিয়ে সকলের চোখ ধাঁধিয়ে ঢুকে পড়লেন মাঠের মধ্যে। এইভাবে মাঠ টপকাতে গিয়ে তিনি একবার ধরাও পড়েছিলেন পুলিসের হাতে। একরাত্তির কাটালেন কয়েদখানায়। অবশ্য তার জন্যে পুস্‌কাসের কোন লজ্জা বা আক্ষেপ ছিল না। তিনি বলেছেন, 'আমি ফুটবলের জন্য চুরি করে কয়েদখানায় রাত্রি বাস করেছি, এর জন্য লজ্জার কি আছে।'

মাঠ থেকে ফিরে মানুষটা যার খেলা ভাল লাগতো, সেই ভালো লাগাকে তিনি অনুসরণ করতেন অনুশীলনের মাধ্যমে। আর এই অনুশীলন তাকে ভবিষ্যতে খাঁটি ফুটবলার হতে সাহায্য করেছিল। একটা বলকে তিনি পায়ের ওপর তুলে নিয়ে একটানা দু-তিনশোবার নাচাতে পারতেন। আর তার শট,—সে তো ভাবাই যায় না। যে কোন দুরূহ কোণ থেকে গোল করার ব্যাপারে তিনি ছিলেন মস্ত ওস্তাদ। চোখ বন্ধ করে তিনি মাঠের যে কোন জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে গোলে বল মারতে পারতেন। তার এই গুণের জন্য তিনি বহুবার সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মানও পেয়েছেন। বিশ্বফুটবল তাকে বলেছে "King of football."

অনুশীলন যে খেলোয়াড় গড়ার মূলমন্ত্র, একথা সবাই স্বীকার করেছেন। স্টানলী ম্যাথুজ, যিনি ফুটবলের জাদুকর হিসাবে একদা ফুটবল রণাঙ্গনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিলেন। সেই তিনিও বলেছেন, 'অনুশীলন কর, অনুশীলনই হলো একমাত্র পথ। আমার বড় হওয়ার পেছনে অনুশীলনই হলো আসল মন্ত্র।' এই অনুশীলনের কথা সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন বিশ্বের সেরা গোলকীপার ইয়াসিন। তিনি দিনের মধ্যে ছ-সাত ঘণ্টা একটানা অনুশীলন করেছেন বরাবর। তার মতে 'অনুশীলনের মাধ্যমে শুধু শরীর গড়ে ওঠে না, সেই সঙ্গে খেলোয়াড় জীবনের ফাটলগুলোও মেরামত করা যায়।' "Practice more practice that makes perfect footballer"

নিরলস সাধনায় যাঁরা বড় হয়েছেন, তাদের মধ্যে নেই কোন

অহমিকা। ফুটবলের এই পঞ্চ পুরুষ আপন বীর্যে বলবান হয়ে ওঠা সত্ত্বেও, তাই বারবার বিনয়ে বলেছেন—আমরা ফুটবলার মাত্র, ফুটবলের জন্য খেলি, সাধনাই আমাদের বড় করে তুলেছে। তাই ফুটবলের জন্য তারা কখনো হেসেছেন, কখনো কেঁদেছেন। বারো স্টোন ওজনের পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি লম্বা ইউসোবিওকে দেখেছি হাজার হাজার দর্শকের সামনে পোর্তুগালের পরাজয়ে দু'চোখ ভিজিয়ে শিশুর মতো কাঁদতে। এ কান্না ফুটবলের জন্য, ফুটবলের ভালোবাসায়, দেশের মর্যাদায়। ঠিক তেমনি ১৯৬৬ সালে অষ্টম বিশ্বকাপ আসরে আহত পেলেকে পরাজয়ের ব্যথায় ডুকরে কেঁদে বলতে শোনা গেছে—'ফুটবল আর নয়। কারণ এখন কেউ ফুটবল খেলেন না, খেলতে দেয় না। কেবল গায়ের জোর কার কত তারই পরীক্ষা হয়।'

পেলের এই উক্তির পিছনে কারণ ছিল সেদিন। রেফারির চোখের ওপর তাকে বল ছেড়ে সরাসরি আঘাত করা হলো। অথচ রেফারি এ ব্যাপারটা চোখে দেখেও না দেখার ছলে এড়িয়ে গেলেন। এটা কি উচিত? পেলে নিজে কখন কোন খেলোয়াড়কে আঘাত করেন নি, খেলার মাঠে কলঙ্কশূন্য স্যার স্টানলী ম্যাথুজ, পুস্কাস, ইউসোবিও, ইয়াসিন। এরা সকলেই খাঁটি স্পোর্টস্‌ম্যান। খেলার মাঠে খেলোয়াড়কে আঘাত করাটা অন্যায়, পাপ। এই পাপ থেকে তাই এই পঞ্চপুরুষ বিরত থেকেছেন সব সময়ের জন্য। নিজেরা আহত হয়েছেন, অন্যে আহত হবার সম্ভাবনায় বল ছেড়ে দিয়েছেন, তবু পাপ থেকে বিরত থেকেছেন সব সময়ের জন্য। তাদের কাছে খেলাটাই হলো বড়—খেলার আনন্দটাই আসল।

আধুনিক ফুটবলে ইউসোবিও হলেন 'গোল পিপাসু'। ঠিক যেমনটি ছিলেন একদা পুস্কাস। গোল না দেওয়া পর্যন্ত তাদের মাথায় যেন রক্ত উঠে যেত। যে করেই হোক গোল একটা দেওয়া চাই। একটা গোলের জন্য কি পরিশ্রমই না তারা করেছেন। পঁয়ত্রিশ চল্লিশ গজ দূর থেকে দুরন্ত শটে বহুবার বল টপকে দিয়েছেন জালে পুস্কাসের মতো ইউসোবিও।

অথচ পেলে, তার কাছে গোল করাটা আসল লক্ষ্য ছিল না কোন দিন। তিনিও স্যার স্টানলী ম্যাথুজের মতো দলকে জেতাবার জন্য প্রয়োজনে দলীয় খেলোয়াড়দের দিয়ে গোল করানোর চেষ্টা করতেন। তাদের কাছে দলই আসল, জাতি হলো বড়, ব্যক্তিগত ভূমিকা সেখানে মূল্যহীন। তাই পেলেকে দেখেছি পেনালটিতে গোল করতে উৎসাহিত না হতে। তার মতে, পেনালটিতে গোল করার জন্য কোন বাহাদুরি নেই। যে গোলের জন্য কোন কৃতিত্ব নেই, তেমন গোল করে কি লাভ ?

স্যার ম্যাথুজের সঙ্গে পেলের মিল এখানেই। দুজনেই যত না নিজে গোল করেছেন, তার চেয়ে সতীর্থদের দিয়ে গোল করিয়েছেন বেশী। তবে পেলের কাছে দু'পায়ের শট্ এবং হেড উভয়ই প্রলোভনের, কিন্তু ম্যাথুজের হেডের ব্যাপারে ছিল অনিহা। তিনি বলতেন, 'ফুটবল পায়ের খেলা মাথার নয়।'

পরিশেষে বলি, তুলনামূলক বিচারে স্ট্যানলী ম্যাথুজ ও পুস্কাস দুজনেই প্রধান। সে তুলনায় পেলে ইউসোবিওর কাছাকাছি। একজন শিল্পী, অন্যজন কর্মী। পেলেকে যারা ভালবাসেন, ইউসোবিওকে তারা ভয় পান। একজন শ্রদ্ধার, অন্যজন ভীতির।

১৯৬৬ সালের বিশ্বকাপ আসরে এই ইউসোবিওকে সামনে রেখে জোরদার বিজ্ঞাপন চালিয়েছিলেন বৃটিশ মহারথীর দল। তারা স্পষ্ট বলেছেন, 'পেলের তুলনায় ইউসোবিও অনেক বড়।' আর এই প্রচারকে কাজে লাগাবার জন্য যে পরিকল্পনা তারা করেছিলেন তা ছিল অত্যন্ত দুঃখজনক। আহত পেলেকে মাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল খেলার বাকি সময়। আর সেই দুঃখেই মহান ফুটবলার বলতে বাধ্য হয়েছিলেন—'আর ফুটবল নয়, এখন ফুটবল ছাড়া আর সব আছে।'

সেদিন যে মানুষটিকে সামনে রেখে বৃটিশ কূটনীতিজ্ঞের দল সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন পেলের বিরুদ্ধে, সেই তিনি স্পষ্ট ভাষায় সাংবাদিকদের বলেছেন—"I will never be able to equal him." "পেলে যে ভাবে খেলেন, আমি সেই খেলা স্বপ্নের মধ্যে প্রায়ই খেলে থাকি। ওকে ছোঁয়ার মতো সামর্থ্য বা শক্তি আমার নেই।"

ফুটবল রসিকের দল ফুটবলের এই পঞ্চবাণকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মতো পঞ্চ নামে ভূষিত করেছেন। যেমন আন্তর্জাতিক ফুটবল মহলে স্যার স্ট্যানলী ম্যাথুজের পরিচয় "এ্যাজলেস্ এ্যানজেল" নামে, পেলের নাম "দ্য ব্ল্যাক পার্ল" পুস্‌কাস "গোল হাঙ্গার" ইউসোবিও "দ্য ব্ল্যাক পেনথার" লেভ ইয়াসিন "অক্টোপাস" বা "এ্যান অনার্ড মাস্টার অফ্ স্পোর্টস্।"

ফুটবলের আঙিনা জুড়ে এই পঞ্চপ্রদীপ চিরকালের জন্য প্রজ্বলিত। ফুটবল যতদিন থাকবে, ততোদিন প্রকৃত ফুটবলারের বৈশিষ্ট্যে অনির্বাণ থাকবে এই পঞ্চপ্রদীপ—যা ফুটবলের কাছে চিরাদর্শ, ন্যায়-নীতি ও দর্শন।

বিতর্কিত পেলে

বিপুল সমারোহের মধ্যে ফুটবলের রাজা বিদায় নিলেন। আর ফুটবল নয়, এবার আমার ঘর সংসার। আমিও তো মানুষ, ঘরনী আছে—সেই ঘরে শান্তি ফিরে আসুক, এই আমার কাম্য।

কিন্তু মাস কয়েক যেতে না যেতেই, হঠাৎ একটা খবরে স্তম্ভিত হয়ে গেল বিশ্বমানুষ। গোটা ব্রেজিল হলো উদ্বিগ্ন। খবরটা কি সত্যি, সত্যি কি ফুটবলের রাজা বিদায় নিচ্ছেন ব্রেজিল থেকে। ব্রেজিলের জাতীয় দল থেকে মানুষটা আগেই বিদায় নিয়েছেন। এখন বিদায়ের পালা দেশের মানুষের কাছ থেকে। খবরটা হু হু বেগে ছড়িয়ে পড়লো বাতাসে। সত্যি কি রাজা চলে যাচ্ছেন, ফুটবলের কালো রাজা দেশত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে—'কস্‌মস ক্লাবে।' এ যে বিশ্বাসযোগ্য নয়, ব্রেজিল তো সব দিয়েছে। হৃদয় উজাড় করা ভালোবাসায় ব্রেজিলিয়ানেরা নতজানু কিং অফ্ ফুটবলারের পায়ের কাছে। গোটা ব্রেজিলই তো তার, তিনি যে ব্রেজিলের জাতীয় সম্পদ। এই সম্পদকে কিনা আমেরিকা কিনে নিয়ে যেতে চায়। এই টাকার অঙ্ক কত?—এই টাকা কি ব্রেজিলের দেশবাসী

তাকে দিতে পারতো না। তিনি যে তাদের রাজা, হৃদয়ের দুলাল—তার জন্য ব্রেজিলিয়ানেরা নিজেদের রক্ত দিতেও প্রস্তুত, আর সেখানে তুচ্ছ টাকার প্রলোভন। একদিন এই টাকার প্রলোভনকে তিনি সগর্বে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। করেছিলেন ব্রেজিলের জন্য, ব্রেজিলিয়ানদের ভালোবাসার কৃতজ্ঞতায়। অথচ আজ সেই তিনিই কিনা মত বদলেছেন—একি মানুষটার মতিভ্রম—নাকি ব্রেজিল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতান্তর? তিনি তো ব্রেজিলের প্রাণ, ব্রেজিলের জন্য তাঁর ভালোবাসাও তো কম নেই। তাহলে—তাহলে তিনি ব্রেজিল ছাড়ছেন কেন?

খবরটা শুনে থমকে গেল বিশ্বমানুষ। দলে দলে ফুটবল প্রেমিকেরা ছুটলেন পেলের আস্তানায়। খবর পেয়ে ক্যামেরা আর খাতা কলম নিয়ে ছুটলেন পত্র-পত্রিকার সাংবাদিকেরা। তাদের চোখে মুখে উৎকণ্ঠা—বুকভরা এক আতঙ্কময় প্রশ্ন—খবরটা কি সত্যি—সত্যি কি আপনি ব্রেজিল ছাড়ছেন, চলে যাচ্ছেন আমেরিকার কসমস ক্লাবে?

লক্ষ লক্ষ উদ্বিগ্ন চোখের দিকে তাকালেন পেলে। হয়ত বা থমকালেন খানিক। তার বুকের গভীরেও হয়ত বেজেছিল বেহাগ রাগিণীর সুর মূর্ছনা। তবু মুখে হাসি নিয়ে বললেন—'কথাটা মিথ্যে নয়, ওরা আমায় খেলার জন্য ধরেছে। আমি এখনও পাকা কথা কিছু দিই নি। তবে টাকার অঙ্ক হেঁকেছি অনেক—ওরা কি রাজি হবে? যদি হয়, তবে আমায় চলে যেতে হবে। এখন সবই নির্ভর করছে কস্‌মস ক্লাব কর্তাদের ওপর।'

ব্যাস, আর কোন কথা নয়। পরের দিন বিতর্কমূলক সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো সংবাদপত্রে। সংবাদে আহত হলেন ফুটবল অনুরাগীরা। শুরু হলো ফুটবলের রাজাকে নিয়ে বিতর্কের পালা। যে মানুষটা দীর্ঘদিন তর্ক-বিতর্কের নাগাল টপকে এক মোহিনী সিংহাসনে ফুটবল আদর্শের প্রতিভূ হিসাবে কোটি কোটি বিশ্ববাসীর হৃদয়ালয়ে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই তিনি কি না আজ এসে দাঁড়িয়েছেন ফুটবলের আদালতে—বিচারের কাঠগড়ায়।

কয়েকদিনের মধ্যে এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করা হলো। আর এই প্রেস কনফারেন্সে পেলে ঘোষণা করলেন তার সর্বশেষ সিদ্ধান্ত।

হ্যাঁ, আমি আমেরিকায় যাচ্ছি—খেলছি কস্‌মস ক্লাবের হয়ে। আমি যে টাকার অঙ্ক দাবী করেছিলাম, তারা সে দাবী মেনে নিয়েছে। এখন আমার কথা রাখার পালা।

কথাটা শেষ করা মাত্র শুরু হলো চীৎকার। একি রাজার মতো কথা হলো। ব্রেজিল কি তোমায় কিছুই দেয় নি। তুমি টাকার জন্য আমেরিকায় চলেছ ফুটবলের ব্যবসা করতে। ঘনঘন ঝলসে উঠলো ক্যামেরার ফ্ল্যাস্‌গান। লোক আর লোক—আজ তারা এসেছেন রাজার শেষ সিদ্ধান্ত শুনতে।

পেলে আবার বললেনঃ—'ফুটবল আমেরিকায় আজ জনপ্রিয় হতে চলেছে। আমার ইচ্ছে, আমি আমেরিকার ফুটবলকে আমার স্বপ্ন দিয়ে সাজাই। ওদেরও তো কিছু দেবার আছে।'

পেলের এই উক্তি ব্রেজিলিয়ানদের আলোচনার পক্ষে যথেষ্ট। শুরু হলো তর্কবিতর্কের পালা। বিতর্কিত নায়ক সর্বকালের সেরা ফুট-বলারকে ঘিরে শুরু হলো তীব্র আক্রমণ। কাগজে কাগজে ব্যঙ্গ রেখা অঙ্কনের সঙ্গে বিদ্রূপ করে বলা হলো : 'আমেরিকা, ব্রেজিল থেকে ভাল প্রতিভা আমদানি করছে। পেলের ব্যবসা মন্দা যাচ্ছিল। টাকার অভাবে মানুষটার দাম্পত্য জীবন সুখে কাটছিল ন', তাই দু লক্ষ পাউণ্ডের বিনিময়ে কস্‌মসের কাছে বাজারের সস্তা আলুর মতো বিক্রি হয়ে গেলেন।'

সকলের সমস্ত বিরূপ মন্তব্যকে নীরবে সহ্য করলেন পেলে। সত্যি তো মোটা টাকার অঙ্ক—কে হাত-ছাড়া করে! তাছাড়া 'ওয়ার্নার কমিউনিকেসন' সংস্থার পাবলিক রিলেশান অফিসারের চাকরি—মাইনেও ভাল, হাতছাড়া করাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

নিঃশব্দে মানুষটা চলে এলেন নিউইয়র্কে। ব্রেজিলের কালো রাজা নিউইয়র্ক বিমান বন্দরে পা দিয়েই হলেন অবাক। গোটা বিমান

বন্দর ছেয়ে মানুষ আর মানুষ। হাজার হাজার ক্যামেরা একসঙ্গে ক্লিক ক্লিক শব্দে ঝলসে উঠলো। এত মানুষ, এরা ফুটবলকে চায়, ফুটবলের রাজার জন্য তাদের অপেক্ষা। আমেরিকার জনপ্রিয় সংবাদ-পত্রের প্রথম পাতায় পেলের ছবি ছাপিয়ে লেখা হলো—'মহামান্য ফুটবলার পেলে' বিশ্বের প্রথম জনপ্রিয় মানুষ। পেলের জনপ্রিয়তা মার্কিন রাষ্ট্রপতির তুলনায় অনেক বেশী।' পেলে ইজ মোর পপুলার দ্যান আমেরিকান প্রেসিডেণ্ট।'

কথাটা মিথ্যে নয়। গোটা আমেরিকার যেখানে তিনি গেলেন, সেখানেই তিনি পেলেন প্রভূত সম্মান। এ সম্মান তো তাকে ফুটবল দিয়েছে—তিনি যে ফুটবলের রাজা। কিং অফ্ ফুটবল—মোস্ট মডারেট এণ্ড স্যায়েণ্টিফিক ফুটবলার ইন দ্যা ওয়ার্ল্ড।

২৮শে জুন ১৯৭৫। স্বয়ং প্রেসিডেণ্টের খাস কামরায় ডাক পড়লো, মহানায়কের। দুই জনপ্রিয় মানুষ এসে দাঁড়ালেন হোয়াইট হাউসের লনে। চারদিকে কাতারে কাতারে মানুষ। সবাই চিৎকার করেছে—'পেলে—ইউ ওয়াণ্ট—পেলে ইন অ্যাকশন।'

জনতার দাবী। বল নিয়ে হাউসের লনে এসে দাঁড়ালেন ওরা দুজন। পেলের দিকে তাকিয়ে প্রেসিডেণ্ট ফোর্ড বললেন, 'এই মুহূর্তে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন শুরু হলে, আপনার জনপ্রিয়তার কাছে আমি হেরে যাব। আপনি নিজের চোখেই তো আমেরিকায় আপনার জনপ্রিয়তাকে বুঝতে পারছেন।'

সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে আমেরিকার আন্তর্জাতিক বৈদেশিক সেক্রেটারী হেনরী কিসিংগার বললেন—'আমি নিশ্চিন্ত, মহামান্য পেলে আমাদের কাছে থাকলে ব্রেজিলের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব আরো বাড়বে। পেলেই হলেন 'ব্রেজিল আমেরিকার' বন্ধুত্বের প্রধান সড়ক, আর ফুটবল হলো একটা সূত্রমাত্র।

তারপর লনের মধ্যে পেলে শুরু করলেন ফুটবল নিয়ে প্রদর্শন দেখাতে। বল পায়ে নাচালেন, তারপর পায়ের বল তুলে নিলেন মাথায়। অবাক বিস্ময়ে মানুষ তখন তাকে দেখছে। এরপর বল দেওয়া

হলো ফোর্ডের দিকে। ফোর্ড হেসে বললেন পেলেকে—'আমি আপনার মতো মাথায় বল নাচাতে পারবো না, তবে পা দিয়ে আমি বল মারতে জানি, ছোট বেলায় একসময় ফুটবল আমিও খেলেছি, তবে তা এমন কিছু নয়।'

এরপরের প্রশ্ন ফুটবল রসিকদের তরফ থেকে তোলা হয়েছিল পেলের কাছে। প্রশ্ন ছিল কস্‌মস ক্লাবকে নিয়ে। এবছর লীগে কস্‌মস কি চ্যাম্পিয়ান হতে পারবে?

উত্তরে পেলে বললেন—'কেউ যদি মনে করেন আমি কস্‌মসে খেলার জন্য দলের চ্যাম্পিয়ান হবার সম্ভবনা ষোলো আনা, তাহলে আমি বলবো, সে ধারণা অত্যন্ত ভুল। একজন ভাল খেলোয়াড় নিয়ে গোটা দল কিছুতেই চ্যাম্পিয়ান হতে পারে না। দলকে জিততে গেলে গোটা দলকে ভাল খেলতে হবে। কাজেই এক পেলের জন্য কস্‌মসের চ্যাম্পিয়ান হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। দেখতে হবে কস্‌মস কেমন দল, ও দলে আর কজন পেলে আছেন। ফুটবল তো একার খেলা নয়। ফুটবল হলো দলগত সংহতির খেলা। দলগত সংহতির প্রশ্নের উত্তর আমি এক পেলে আপনাদের দিই কি করে?

কস্‌মসের হয়ে পেলে প্রথম খেলায় ডিপ্লোম্যাট দলের বিরুদ্ধে দিলেন দর্শনীয় দু-দুটি গোল। যে গোল দুটি দেখে আমেরিকার মানুষ মুহূর্তের জন্য হলো স্তম্ভিত। বিস্ময় ভরা চোখে প্রথম দর্শনেই তারা বলে উঠলেন—Amazing! really amazing!

আধুনিক ফুটবল প্রসঙ্গে পেলে

ফুটবল এখন আর আগের মতো নেই। আজকের ফুটবল যেমন উন্নত তেমনি হয়ে উঠেছে বিজ্ঞান সম্মত। বিজ্ঞান সম্মত ফুটবলের ধরনধারণ একটু আলাদা ধরনের। আজ বিশ্ব ফুটবলের আসরে সব দেশই তার খেলার ধারাবাহিকতাকে বদলে নতুন ছকের আমদানি করেছে। পরীক্ষা-

মূলকভাবেই গড়ে উঠেছে ফুটবলকে নিয়ে আন্তর্জাতিক গবেষণা কেন্দ্র। মনে রাখতে হবে আজকের ফুটবল একজনের খেলা নয়, এ হলো দলগত সার্বজনীন খেলা। এই খেলার মধ্যে তাই আধুনিক নিয়মে ব্যক্তিগত ফুটবলারের বৈশিষ্ট্য প্রধান নয়। আজকের ফুটবল সকলকে নিয়ে, সকলের জন্য। দলে একজন খেলোয়াড় ভাল থাকলেই যে দল জিতে যাবে, একথা তাই আজ আর স্বীকার করা চলে না। বরং সেই ভাল খেলোয়াড়ের দায়িত্ব হবে, নিজেকে দশজনের সঙ্গে মিলেমিশে দশজনের মতো করে খেলার চেষ্টা করা। তা না করে সেই খেলোয়াড় যদি নিজেকে দর্শকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেন, তাহলে ব্যক্তিগত চাতুরি প্রকাশ পেলেও দলগত দিক দিয়ে তা হবে ক্ষতিকারক। নিজেকে দেখানোর চাইতে গোটা দলকে সামগ্রিকভাবে দেখানোর দায়িত্ব আজ প্রতিটি খেলোয়াড়ের ওপর। তাই নিজে খেল, এবং অপরকে খেলতে দাও এই হলো মর্ডান ফুটবলের মূল শিক্ষা।

নিজের গোল করার মধ্যে আনন্দ আছে একথা আমি জানি। কিন্তু তার চাইতেও বড় অনন্দ হলো বড় আসরে দল জেতায়। কারণ দল জিতলেও আমিও জিতবো, বড় খেলায় জিতে আর বড় খেলায় অংশ নিতে পারবো। কিন্তু তা না করে যদি আমি একাই খেলি, আর সেই খেলার পর যদি দল হেরে যায়, তাহলে সে খেলার সার্থকতা কোথায়। দল হারলেও আমি হেরে যাব—বড় আসর থেকে আমাকেও সরে যেতে হবে দলের সঙ্গে। কাজেই দলকে জেতানো, আর সেই জেতানোর জন্য অন্য একজনকে দিয়ে গোল করানোর ওপর গুরুত্ব দিতে হবে প্রতিটি ফুটবলারকে। এমন অনেক সুযোগ আসে, সেখানে নিজে বল গোলে মারার চাইতে অন্যকে বলটা ঠেলে দিলে নির্ঘাত গোল হয়—সে ক্ষেত্রে অনেককে দেখেছি, পাশের খেলোয়াড়কে বল না ঠেলে নিজে ঝুঁকি নিয়ে গোলে মারতে। এই ধরনের কাজ ফুটবলার হিসাবে নৈতিক দিক দিয়ে অপরাধ। মনে রাখতে হবে, আমরা ফুটবলারেরা দলের জন্য খেলছি, নিজের জন্য নয়।

যদি তুমি সত্যিকার ফুটবলার হতে চাও, তাহলে তোমাকে বলি

সবার আগে ফুটবলকে ভালোবাসো। ভালোবাসা ছাড়া বড় হওয়া যায় না। একজন ফুটবলারকে মনে রাখতে হবে, ফুটবল তার ধ্যান, জ্ঞান, এমনকি ফুটবলের জন্যই তার চেতনা স্বপ্ন। স্বীকার করতে আমার বাধা নেই, আমি ঘুমের মধ্যেও ফুটবলের স্বপ্ন দেখেছি। এই স্বপ্নই আমাকে বড় করবে। মনে রেখ অনুশীলন হলো খেলোয়াড় জীবনের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। এই চাবিকাঠি হাত-ছাড়া হলে—কোন স্বপ্নই আর বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হবে না। অনুশীলন তো তোমার নিজের হাতে। নিজের শরীর স্বাস্থ্যের সামর্থ্য অনুযায়ী নিজের হাতে নিজেকে গড়ে তোলার একটা কৌশল মাত্র। অধিক পরিশ্রম স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী পরিশ্রম করাই সকলের প্রয়োজন। যতটুকু শিখবে মন দিয়ে শিখবে। একদিনে বেশী শেখার প্রয়োজন কি? ওতে শরীর ভেঙে পড়তে পারে। বরং তার চেয়ে দিনে তুমি স্বল্প শেখ। কিন্তু যা শিখবে মন দিয়ে শিখবে, চোখ দিয়ে দেখবে, যাতে ভুল না হয়। খেলোয়াড় জীবনে ভুল করা অপরাধ নয়। কারণ খেলোয়াড় মাত্রেই মানুষ। এই ভুলকে সংশোধন করার জন্যই অনুশীলন। অনুশীলনের অভ্যাস ফুটবলারকে সার্থক করে তোলে।

তুমি একজন খেলোয়াড়—এই কি শুধু তোমার পরিচয়। মনে রাখতে হবে, খেলোয়াড় মাত্র জাতীয় প্রতিনিধি, জাতীয় চরিত্রের ধারক। কাজেই খেলোয়াড় মাত্র চরিত্রবান হওয়াটা প্রয়োজন। খেলোয়াড়ের চরিত্র সামাজিক মানুষের মতোই ন্যায়-নীতির সম্পর্ক জড়িত। তুমি খেলোয়াড় তোমার দায়িত্ব অনেক। কাজেই তোমাকে সমস্ত দয়িত্বের কথা স্মরণ রেখেই মেজাজকে সবসময়ের জন্য রাখতে হবে সংযত, শান্ত, ঠাণ্ডা। খেলতে নেমে মাথা গরম করা ভাল খেলোয়াড়ের লক্ষণ নয়। খেলোয়াড় হলেন খেলার রণাঙ্গনে সেনাপতি। তার দৃষ্টি হবে যেমন সতর্ক, তেমনি সংযত। সংযত মেজাজ ভাল খেলোয়াড় হয়ে ওঠার একটা মস্ত বড় গুণ।

তুমি খেলোয়াড়, তোমার পায়ে বল, তোমাকে আঘাত করার জন্য সকলে প্রস্তুত। তোমার লক্ষ্য হবে ওদের আঘাতকে টপকে নিজেকে

অক্ষত রেখে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। তোমাকে মেরেছে বলে তুমি যে পাল্টা আঘাত করবে, এটা প্রকৃত ফুটবলারের চরিত্র নয়। প্রকৃত ফুটবলারকে হতে হবে মানবিক জ্ঞানসম্মত আদর্শের প্রতীক। খেলার জন্য খেলা, খেলার আনন্দটাই এখানে বড়।

অনেক খেলোয়াড় আছেন, যারা নিজেদের সবজান্তা মনে করেন। একটু প্রশংসা পেলেই তারা মনে করেন, কিনা হয়ে গেছি। সত্যি বুঝি আমি জেনে গেছি ফুটবলের যাবতীয় কারিকুরি। ফুটবলার হিসাবে এই ধারণা অপমৃত্যুর সামিল। মনে রাখতে হবে আমাদের একজীবনে সব জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়। আমরা যা জানি তার চাইতেও অজানা আরো অনেক কিছু আছে তা আমাদের জানতে হবে। মনোভাবে যদি ছাত্র-মেজাজ না থাকে, তাহলে ফুটবলার কখনই বড় হতে পারেন না। শিক্ষা আমাদের প্রতিমুহূর্তে। প্রতিদিনই আমরা কিছু না কিছু শিখি। সূর্য উঠছে, আমরা খাচ্ছি, তেমনি মনে রাখতে হবে, প্রতিদিন এই সূর্যালোকের সঙ্গে আমরাও কিছু না কিছু শিক্ষাকে গ্রহণ করছি। প্রকৃতির দিকে তাকালেই দেখবে সে কতবড় জাদুকর। কত তার মহান গুণাগুণ। সে তুলনায় তুমি কত দীন। দেখবে এই মনোভাব বজায় রাখলে তোমার মনে কোন অহংকার স্থান পাবে না। তুমি নিজেকে আরো কিছু জানার জন্য, শেখার জন্য প্রস্তুত করতে পারবে।

ফুটবলারকে অবশ্যই হতে হবে এ্যাথলেট। অনেকে মনে করেন ফুটবলের সঙ্গে এ্যাথলেটের সম্পর্ক কি। আসলে শরীর তো ফুটবলের মধ্যে আছেই আছে। তাকে বাদ দিয়ে ফুটবলারের তো আর কোন বিকল্প শরীর গড়ে ওঠে না। তাই সবার আগে শরীরকে ফুটবলের উপযোগী করে তুলতে হবে আমাদের। আর তারি জন্য প্রয়োজন এ্যাথলেটের। ভাল স্বাস্থ্য ভাল মানসিকতার লক্ষণ। আর ভাল মানসিকতা ভাল ফুটবলার গড়ে দেয়।

ফুটবলের বাসনাকে যদি বাস্তবে কার্যকরী করতে চাও তো সবার আগে নিজেকে সাবধান কর। রক্ষা কর নিজেকে ধূমপান ও মাদকজাতীয় নেশার হাত থেকে। যে কোন ধরনের নেশাই ফুটবলের পক্ষে

ক্ষতিকর। যিনি ফুটবলার তাঁর পক্ষে হওয়া উচিত একটি মাত্র নেশা—তা হলো ফুটবল খেলা এবং ভাল খেলা।

ভাল খেলা দেখা সব সময়ের জন্য দরকার। ভাল খেলা দেখতে দেখতেই ভাল খেলা শেখা যায়। তার প্রমাণ অনেকেই এবং আমি তার মধ্যে একজন। ভাল খেলা দেখে, ভাল কায়দাকে নিজের মতো করে রপ্ত করার মধ্যে আছে এক ধরনের আত্মতৃপ্তি। মনে রাখতে হবে প্রতিভা শিক্ষা-নিরপেক্ষ নয়। প্রতিভাকে বিকাশের জন্য নিয়মিত শিক্ষার প্রয়োজন, আর এই শিক্ষার একটা উপাদান হলো ভালো খেলা দেখা।

অনুকরণপ্রিয়তা মনের মধ্যে যেন না থাকে। একজন বড় খেলোয়াড়কে অনুসরণ কর, কিন্তু তা বলে অনুকরণ নয়। অনুকরণ প্রবণতা খেলোয়াড়ের স্বাভাবিকতাকে নষ্ট করে দেয়। একজনের ছায়ায় নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার মধ্যে কি সত্যিকার কোন আনন্দ আছে? নিশ্চয়ই নেই, তাই যদি হয়, তাহলে অনুকরণ কিসের জন্য। মনে রাখতে হবে প্রতিটি ফুটবলারের মধ্যে একজন করে স্বকীয় গুণ-সম্পন্ন ফুটবলার আছেন। প্রতিটি ফুটবলারের দায়িত্ব সেই নবাগত আদর্শময় ফুটবলারকে প্রতিষ্ঠা করা। মনে রেখ, আমি পেলে তোমাদের বলছি, তোমাদের মধ্যে আছে হাজার পেলে। তোমরা সেই পেলেদের আত্মপ্রকাশের সুযোগ দাও। এক পেলের জন্য যেন অন্য পেলেদের মৃত্যু না হয়। "Do not try to make yourself Pele. It is much more important to be yourself than Pele."

মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানুষ থেকে যায়। এই থেকে যাওয়াই হলো পেলের প্রতিষ্ঠা। এক পেলে যাবে, অন্য পেলে আসবে, সিংহাসন খালি নাহি রবে। হে আমার ভবিষ্যতের ফুটবলারেরা—তোমাদের বলছি, তোমরা তোমাদের পেলেকে প্রতিষ্ঠা করে—আজকের পেলেকে মুছে দিও। যদি পার আমি তাতে আনন্দিতই হবো। মনে করবো ফুটবল এগিয়ে গেছে, আমি পিছিয়ে গেছি, আবার তাহলে আমাকে ফুটবলের ভালোবাসার তাগিদায় ফিরে আসতে হবে তোমাদের কাছে। আর

যদি তা না হয়, তাহলে ফুটবল থেমে যাবে, আমিও স্মৃতিভারে হয়ে উঠবো স্থবির। সচল পৃথিবীতে বুঝবো একমাত্র ফুটবলই থেমে আছে—ফুটবলের মৃত্যু হয়েছে—ফুটবল মৃত।

পরিশেষে বলি—ফুটবলের জন্য একজন ভাল পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন। ঠিকঠাক পথের নির্দেশ পেলে ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যাওয়া কঠিন। আমি সৌভাগ্যবান, কিশোর বয়েসেই পেয়েছিলাম বাবার সাহচার্য, সঙ্গে ঋষিতুল্য ফুটবলার ব্রিটোর পরামর্শ। ব্রিটো আমার গুরু—গুরু মন্ত্রই আমাকে বড় করেছে। তাই বলি গুরু ধর—গুরু ছাড়া কোন কিছুই শুরু করা ঠিক নয়। ভালো কোচের উপদেশ, পুরনো খেলোয়াড়দের অভিজ্ঞতা যত পারবে শুনবে। মনে রেখ জীবন-ভোরই আমাদের শিক্ষা। কোন শিক্ষা বা উপদেশই ফেলার নয়। আমি তাই উপদেশ শুনেছি বিস্তর, মেনেছি আদেশ। আমি মনে করি ফুটবলার হিসাবে সব আদেশই বেদবাক্য। কোন উপদেশেই ফেলার নয়। যত জানি, ততো শিখি, যত দেখি ততো বুঝি—এই হলো আমার নীতি। আমার কাছে ফুটবলার মাত্রই সম্মানের—তা সে যতই তরুণ হোক না কেন। মনে রাখা দরকার একজন তরুণ ফুটবলার জাতীয় সম্পদ—প্রবীণ ফুটবলারের চাইতে তাদের ভূমিকা ফুটবলের কাছে অনেক বেশী।

আমি বাস্তববাদী। এই কথা বুঝি আজ যারা আমার চারিদিকে, তারা একদিন কেউ আমার কাছে থাকবে না। একদিন আমি বুড়ো হবো, বিদায় নেবো ফুটবল থেকে, তখন আজকের এই মানুষজনেরা আমার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেবেন, তাদেরই বলতে শুনবো, 'Pele is no more, he is dead.'

জীবনের কাছে এই মন্তব্য সত্যি—তাই আমি নিজেই নিজেকে বলি—"I am not immortal. So that I am prepared for the time. I go back being just Edson—Arrates Do—Nascimento."

মনে রেখ একজন ফুটবলারের প্রকৃত অর্থই হলো একজন নিয়মানুবর্তী মানুষ—যিনি সংযমী—ধীর স্থির এবং সর্বোপরি মানবতাবোধ সম্পন্ন।

কসমস বনাম পেলে

ব্রাজিলের কালোমানিক মহান ফুটবলার পেলে সোনার পালঙ্কে চেপে চলে এলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে—যোগ দিলেন আমেরিকার এক ধনী দল কসমস ক্লাবে। স্যান্টোস ছেড়ে কসমসে—খবরটা শুনে তাই প্রথমটায় সবাই থমকে ছিলেন। একি সত্যি—পেলে ব্রাজিল ছাড়ছেন, ছাড়ছেন স্যান্টোস। আর যদি বা ছাড়েন, তাহলে কসমসের মতো একটা তৃতীয় শ্রেণীর দলে যোগ দিতে হবে তাকে।

প্রথমে বলি, আমেরিকা ফুটবলে খুব একটা শক্তিশালী নয়। পেশাদার ফুটবলের ভূমিকা তাদের দেশে খুবই নগণ্য। ১৯৭০-৭১ সালে এক নতুন চিন্তাধারা নিয়ে এই কসমস ক্লাবের সৃষ্টি। নিউ-ইয়র্কের প্রখ্যাত ধনকুবের ক্লাইভ টোরী হলেন এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা। আমেরিকায় ফুটবলকে প্রচার ও প্রসারের জন্য টোরী তার এই ক্লাব তৈরি করে দেশবিদেশ থেকে দলে নিয়ে এলেন একাধিক পেশাদার ফুটবলারকে।

পেলে এলেন কসমসে। ব্রাজিলবাসী পেলের বিচ্ছেদে ব্যথায় ব্যাকুল হলেন। কেউ কেউ বললেন, পেলে তুমি ব্রাজিল ছাড়ছ কেন—টাকার জন্য ? কত টাকা তোমায় দেবে কসমস ?

উত্তরে পেলে বললেন, টাকার মোহ আমার নেই। অর্থ উপার্জন আমি বহু করেছি। টাকার জন্য দেশ ছাড়ছি কথাটা ঠিক নয়। আমি আমেরিকায় যাচ্ছি, ফুটবলের উন্নতির কথা চিন্তা ভাবনা করে। আমি চাই দেশে দেশে বন্ধন, সখ্যতা, বন্ধুত্ব, আন্তরিকতা। আমার বিশ্বাস নির্মল বন্ধুত্ব একমাত্র এনে দিতে পারে ফুটবল। তাই আমেরিকার জনমানসে ফুটবলের জনপ্রিয়তাকে গড়ে তুলতে আমার এই সিদ্ধান্ত।

পেলে ব্রাজিল ছেড়ে আমেরিকায় এলেন। রাষ্ট্রপতি ভবনে

তাকে সংবর্ধনা দেওয়া হলো। স্বয়ং আমেরিকার রাষ্ট্রপ্রধান তার সঙ্গে মিলিত হলেন। পেলেকে দেখার জন্য নিউইয়র্কের রাস্তায় ভিড় বাড়লো। পত্র-পত্রিকার সাংবাদিকেরা তার পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন ক্যামেরা নিয়ে। পেলের প্রতি আমেরিকাবাসীর উৎসাহ লক্ষ্য করে আমেরিকার রাষ্ট্রনায়ক জেরাল্ড ফোর্ড হোয়াইট হাউসে দাঁড়িয়ে পেলেকে বললেন, "এই মুহূর্তে আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট পদের জন্য নির্বাচন হলে আমি আপনার কাছে বিপুল ভোটের ব্যবধানে হেরে যাব।"

কথাটা মিথ্যে নয়—পেলের আবির্ভাবে মার্কিন মণ্ডলে বেড়ে গেল ফুটবলের গুরুত্ব। যে মাঠে লোক হতো না—সেই খেলা দেখতে হাজির হলেন তরুণ-তরুণীর দল।

বিশ্ব ফুটবলের জীবন-দেবতা পেলেকে নিয়ে কসমস দল কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে সফল হতে পারে নি। ১৯৭১ সালে কসমস লীগে ব্যর্থ হলো। ব্যর্থ হলো ১৯৭২ সালে। ক্লাব প্রেসিডেন্ট দলের প্রয়োজনে বিদেশ থেকে কিনে নিয়ে এলেন বেশ কিছু ফুটবল তারকা। ইংল্যাণ্ড ও ব্রেজিলের পেশাদার মাঠ থেকে খেলোয়াড় সংগ্রহ করে নিয়ে এসেও কসমস ভাল ফল দেখাতে পারলো না। ফলে ক্লাবের মধ্যে অসন্তোষ দেখা গেল। তারা বুঝতে পারলেন, দলের মধ্যে আধা ইউরোপ আধা আমেরিকান স্টাইলের খেলাই হলো তাদের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। ফলে ক্লাব কর্তৃপক্ষ সমস্ত দিক চিন্তা করে নতুন স্ট্র্যাটিজি গড়ার দিকে নজর দিলেন।

এই সময় কসমস ক্লাবের ক্লাইভ টোয়ী মোটা টাকার বিনিময়ে দলে আনার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন ইউরোপের দুই শ্রেষ্ঠ ফুটবলারকে। একজন বেকেনবাউয়ার, অন্যজন হলেন জর্জ বেস্ট। এই দুই ফুটবলারদের সঙ্গে কথা যখন প্রায় পাকা হতে চলেছে—ঠিক তখনই অপ্রত্যাশিত-ভাবে কসমস পেয়ে গেলো পেলেকে।

পেলে অবশ্য কসমসে যাওয়ার কথা মোটেই চিন্তা করেন নি। তার ইচ্ছে ছিল ফুটবল থেকে একেবারে সরে যাবেন। তাই তার

কাছে যখন কসমস ক্লাব প্রথম অফার দেয় তখন তিনি কিন্তু মোটা টাকা হেঁকে বসেছিলেন। ভেবেছিলেন এই টাকা হয়তো তাকে কসমস দিতে চাইবে না। কিন্তু তা হলো না—বরং কসমস ক্লাব কর্তৃপক্ষ পুরো টাকা মিটিয়ে দিয়ে পেলের সঙ্গে এক নয়া চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন।

এত করেও দলের মর্যাদা কিন্তু বাড়ানো সম্ভব হলো না। বিশেষ করে ১৯৭৪ সালের লীগ শেষে দেখা গেল কসমসের স্থান হয়েছে একবারে নিচের দিকে। মোট কুড়িটি খেলার মধ্যে তারা জিতেছে মাত্র ৬টি খেলায়।

কসমসের ফলাফল দেখে নতুন আর এক চিন্তায় পড়লেন ক্লাব প্রেসিডেণ্ট মিস্টার টোয়ী। তিনি এবার তল্লাসি চালালেন বিশ্বের দামী দামী ফুটবলারদের কেনার জন্য। প্রসঙ্গ উল্লেখ্য—এই সময় তাদের মূল লক্ষ্য ছিল পশ্চিম জার্মানীর ফ্রন্জ বেকেনবাউয়ার ও ১৯৬৬'র বিশ্বকাপের খেলার হ্যাটট্রিকের অধিকারী জর্জ বেস্টের উপর। কিন্তু ক্লাব কর্তাদের এই চেষ্টা কার্যকরী হওয়ার মুখেই তারা অপ্রত্যাশিত ভাবে পেয়ে গেলেন "পেলেকে"।

"পেলে"—ফুটবলের জাদুকর। আধুনিক ফুটবলের কিংবদন্তী। কাজেই পেলেকে তারা হাতে পাওয়ার ফলে অন্যদের ওপর থেকে সরিয়ে নিলেন নিজেদের লক্ষ্যকে।

সংবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব ফুটবলে পড়ে গেল সোরগোল, চারিদিকে দেখা গেল তুমুল উত্তেজনা। মার্কিন মুলুকের নয়া প্রতিষ্ঠিত একটা সাদামাটা দল পেলের আবির্ভাবের ফলে রাতারাতি হয়ে উঠলো বিশ্ববিখ্যাত। দূর-প্রাচ্যের মানুষ সেই প্রথম জানতে পারলেন, আমেরিকাও ফুটবলে আগ্রহী—কসমস সেখানকার একজন ধনকুবেরের লালিত ফুটবল দল।

আগেই বলা হয়েছে, এই কসমসে আসা নিয়ে পেলেকে কম ঝক্কি সামলাতে হয় নি। বিশ্ববরেণ্য এই ফুটবলারকে এর জন্য শুনতে হয়েছে অনেক কটূক্তি। বিশেষ করে যে ব্রেজিলের মানুষ একদিন তাকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠা করেছিল, সেই তারাই তাকে সর্বাগ্রে করলে

সরাসরি আক্রমণ। আহত, দুঃখিত পেলে অবশ্য এসব কথায় কোন উত্তর করেন নি। তিনি নিঃশব্দে মোটা টাকার চুক্তির বিনিময়ে ব্রেজিল থেকে পাড়ি দিয়ে দিলেন নিউইয়র্কের পথে।

সেই কসমস প্রথম ঝড় তুলেছিল বিশ্ব ফুটবল ক্রীড়াঙ্গনে। এই ঝড়ো হাওয়া যে পশ্চিম জার্মানীকে স্পর্শ করে নি তা নয়, করেছিল।

পেলের আবির্ভাবে গোটা আমেরিকার ফুটবল জগতকে নতুন করে নাড়া দিল যেন। শুরু হলো পেলেকে ঘিরে আমেরিকায় নয়া গুঞ্জন। অনেকেই আশা করেছিলেন পেলের আবির্ভাবে কসমস হয়তো নব ক্রীড়া-ধারার পরিচয় দিয়ে লীগ খেলায় নিজেকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু খেলা শুরু হতেই চোখ ফুটলো সকলের। আমেরিকার ফুটবল মাঠে জাদুকর পেলে হয়ে উঠলেন নিষ্প্রভ। কিছুতেই তিনি সুবিধে করতে পারলেন না। এমনটি যে হবে, এ কিন্তু কেউ আশা করে নি। বরং সকলে প্রত্যাশা করেছিল শিল্পী তার আপন শিল্প সুষমার জলুসে নয়া এক ফুটবল ধারাকে প্রতিষ্ঠা করবেন আমেরিকায়। কিন্তু ফল হলো উল্টো। পরপর খেলায় হারতে লাগলো কসমস ক্লাব। এমনকি বোস্টনের একটা সাদামাটা ছোট দলের কাছেও ৫-১ গোলে হারার পর বেশ খানিকটা থমকে গেলেন আমেরিকান ফুটবল অনুরাগীরা। শুরু হলো পেলেকে ঘিরে কসমস ক্লাব মহলে বিতর্ক। শেষদিকে যদিও তিনি ক্লাব ম্যাচে অংশগ্রহণ করেন নি, তবু বড় খেলোয়াড় হিসাবে দলের শোচনীয় ব্যর্থতার জন্য সর্বাগ্রে দায়ী করা হলো তাকে।

মরশুম শেষ হতেই কর্তৃপক্ষ নতুন করে দলকে ঢেলে সাজাবার কাজে মন দিলেন। এই সময় কসমস দলের অধিকাংশ ফুটবলারই ছিলেন উরুগুয়ের। তাদের বাতিল করে এবার নজর দেওয়া হলো ইংলিশ ফুটবলের ওপর। গোটা ডিফেন্স সাজানো হলো বৃটিশ ফুট-বলারদের দিয়ে। আর আক্রমণ রচনায় পেলেকে সাহায্য করার জন্য দলে নেওয়া হলো মিদিন ও ল্যাটিন-আমেরিকার চিন গ্যালিয়াকে।

মরশুম শুরুর মুখে কসমস দলের নয়া সাঁজোয়া বাহিনীর দিকে তাকিয়ে ক্লাব কর্তৃপক্ষের দল খুশী হলেন। তারা আশা করলেন চলতি

বছরে ফলাফল অবশ্যই ভালো হতে বাধ্য। কিন্তু এত করেও মরশুম শুরু হওয়া মাত্র নিজেদের ভুল বুঝতে পারলেন কর্তৃপক্ষ। হারের পর হার নিয়ে লীগ খেলায় অংশ গ্রহণ করতে লাগলো কসমস দল। দলের এই শোচনীয় ব্যর্থতার জন্য এবার দায়ী করা হলো ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়দের। কর্তৃপক্ষ বললেন, দলের পরাজয়ের জন্য আমাদের ডিফেনডার'রাই হলেন দায়ী। তাদের দুর্বলতার ফাটল দিয়েই কসমসের পরাজয়ের আঘাত আসছে। অতএব ডিফেন্সকে নতুন করে ঢেলে সাজানো দরকার। এই সময় অনেকে প্রস্তাব দিলেন, দলের ক্রীড়া-ধারার উন্নতির জন্য আমাদের উচিত ব্রেজিল থেকে অবিলম্বে ব্যাক, হাফ-ব্যাক ও স্টপার নিয়ে আসা।

এই প্রস্তাবকে যেমন অনেকে সমর্থন করলেন, তেমনি আবার অনেকে তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে বললেন, যাক, খুব হয়েছে। পয়সা খরচ করে ব্রেজিল থেকে আর কোন ডিফেনডার আনার দরকার নেই। কেবল অর্থদণ্ড—এক পেলেতেই আমরা বুঝেছি—এত টাকা ক্লাব কর্তৃপক্ষের খরচ করার কোন মানেই হয় না। এক পেলেই এখন ক্লাবের কাছে গলগ্রহ,—সমস্যা বিশেষ।

মহান ফুটবলারের বিষয়ে এই উক্তি শুনে নিশ্চয়ই সকলে চমকে উঠছেন!

সত্যিই তাই—কসমস ক্লাবের মধ্যে পেলেকে কেন্দ্র করে বিরাট এক তর্ক-বিতর্কের ঝড় বয়ে গেছে। শুনলে হয়তো অনেকে অবাক হবেন ; পেলেকে দল থেকে বসিয়ে দেওয়া যায় কিনা, এই ব্যাপারেও চিন্তা করেছিলেন ক্লাব কর্তারা। শেষ পর্যন্ত পেলেকে কেন্দ্র করে ক্লাবের মধ্যে এমন একটা জটিল পরিস্থিতি তৈরি হলো যে, ক্লাব থেকে বাধ্য হয়ে চাকরিতে ইস্তফা দিলেন দলীয় কোচ॥

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ১৯৭০ সালের কথা। ব্রেজিল তৈরি হচ্ছে বিশ্বকাপ খেলার জন্য। দলে আছে বহু তরুণ ফুটবলার। ছেষট্টির ব্যর্থতার যোগ্য জবাব দেওয়ার জন্য ব্রেজিল কর্তৃপক্ষ সালাধানার হাতে তুলে দিয়েছেন জাতীয় কোচিং-এর দায়-দায়িত্ব।

সালাধানার পরিচয়—একজন বিতর্কিত মানুষ। যৌবনে কম্যুনিস্ট। স্পষ্ট বক্তা। মুখের ওপর কারো সম্পর্কে কোন কঠিন কথা বলতে তার বাধে না। তা ছাড়া তিনি ছিলেন অত্যন্ত হঠকারী মেজাজের। কোনরকম ঝুঁকি নিতে তিনি মোটেই দ্বিধাগ্রস্ত নন। ব্রেজিলের কোচিং হাতে নিয়েই সালাধানা বেশ কিছু রদবদল করলেন দলের। ক্যাম্প থেকে পত্রপাঠ বিদায় করলেন বহু নামী খেলোয়াড়কে। সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার মাস তিনেক আগে হঠাৎ তিনি বলে বসলেন, "পেলে আউট-অফ-ফর্ম—ওর সেই আর আগের মত গতি নেই, তেজ নেই। অতএব তাকে জাতীয় দলে নেওয়া চলে না।"

পেলে তখনও জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। কাজেই সালাধানার এই উক্তির বিরুদ্ধে কঠিন সমালোচনা করা হলো। এমনকি তার স্পর্ধার জন্য তাকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে সরে যেতে হলো জাতীয় কোচের পদ থেকে।

পাঠকদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে ১৯৭০ সালের পরবর্তী অধ্যায়ের কথা। জাগালো সালাধানার জায়গায় জাতীয় কোচের দায়িত্ব নিয়ে পেলেকে অর্পণ করলেন দলীয় আক্রমণের সমস্ত গুরু দায়িত্ব। মেকসিকোর আসরে বর্ষীয়ান্ পেলে চতুর্থবার বিশ্বকাপ খেলতে এসে নতুন করে প্রমাণ দিলেন, তিনি এখনও বিশ্বশ্রেষ্ঠ। নবাগত টোস্টাও জিয়ারজিনো, রিভালিনোর সঙ্গে সমান তালে নৈপুণ্য দেখিয়ে ফাইনালে ইতালির বিরুদ্ধে দর্শনীয় গোল দিলেন পেলে—প্রমাণ করলেন নিজের শ্রেষ্ঠত্বকে।

আজ আবার দীর্ঘদিন বাদে সেই একই সমালোচনা। পেলে বললেন কসমস ক্লাব কর্তাদের, আমি তো আগেই আমার বক্তব্য রেখেছিলাম। একবার মনে করে দেখুন আমার কথাগুলো। কি বলেছিলেন পেলে?

পেলে বলেছিলেন—"কসমস ক্লাবে আমি সই করেছি ভেবে কেউ যেন মনে না করেন, কসমস দল লীগের খেলায় শীর্ষস্থান পাবে। একজন ভাল খেলোয়াড় নিয়ে আজকের দিনে খেলায় জেতা যায় না। এখনকার ফুটবলে দলের সকলের দায়িত্বই সমান—তাই সকলের আগে

দরকার দলীয় ক্রীড়াধারার মধ্যে ঐক্যবদ্ধতা গড়ে তোলা! শিল্প সম্মত ঐক্যবোধই পারে কোন দলকে প্রতিষ্ঠা করতে। কোন ব্যক্তির একক ব্যক্তিত্বকে আধুনিক ফুটবল কখনই গ্রহণ করে না। অন্তত আমার নিজের তাই বিশ্বাস।

কসমস দলের ক্রীড়াধারার দিকে তাকিয়ে একথাই বলা যায় না কি, মহামান্য পেলের এই উক্তিই তার নিজের দোষ খণ্ডনের পক্ষে যথেষ্ট। যে দলে আছেন বহু দেশের বিভিন্ন ফুটবল ধর্মী খেলোয়াড়—সেই দলের পক্ষে কি কোন আদর্শগত সংহতি কোনদিন গড়ে ওঠে, না কি গড়ে তোলা যায়? কাজেই ক্রীড়ানৈপুণ্যের এই অসামঞ্জস্যতার মধ্যে দাঁড়িয়ে এক জাদুকর পেলের পক্ষে যে কোন গৌরব মহিমা অঙ্কন করা সম্ভব নয়, এই কথা অনায়াসে বলা যায়। তাই দেখা যাচ্ছে, ফুটবল বিশ্বের দুর্লভ মণিমুক্তার সমাবেশে গড়ে তোলা কসমস নামক গয়নাটির মধ্যে বাহ্য জৌলুস থাকলেও, কিসের অভাবে যেন তা শিল্পবোধের গরিমায় নিজেকে ফুটিয়ে তুলতে পারছে না।

অভাব—কিসের অভাব, এ কথা কি কসমস ক্লাব কর্তার দল কখনো ভেবে দেখেছেন? কেবল অর্থের জোরে যদি শিল্পবোধের অভাব মোচন সম্ভব হতো, তাহলে যথার্থ শিল্পীর কোন প্রয়োজন থাকতো না জগতে। তা হয় না বলেই প্রয়োজন দক্ষ শিল্পের জন্য দক্ষ শিল্পীর। কিন্তু কসমস দলে এই সুসংবদ্ধতার দক্ষ শিল্পীর বড়ই অভাব। দলের তালিকার দিকে চোখ রাখলে আমরা দেখতে পাবো, সেখানে আছেন বিশ্বের সব নামকরা মূল্যবান ফুটবলারেরা—তারা কেউ ব্রেজিলের, কেউ ইতালীর, কেউ জার্মানী, কেউ বা ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স বা উরুগুয়ের। এর ফলেই কসমস দলের ক্রীড়াবিন্যাস কোন সুষ্ঠু পথে ধাবিত হতে পারছে না। একাধিক দেশের একাধিক খেলোয়াড় থাকার জন্য তাদের খেলার মধ্যে দেখা যাচ্ছে অবিন্যস্ততার ভাবধারা। যে ক্রীড়াধারকে পর্যালোচনা করলে আমরা বলতে পারি কসমসের খেলার মধ্যে কোন প্রাণ নেই। তাদের ক্রীড়াবিন্যাস না ইউরোপীয়, না দক্ষিণ আমেরিকান।

কাজেই অবিন্যস্ত এই ক্রীড়াবিন্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে পেলের মতো শিল্পীর কি সম্ভব, কেবলমাত্র একক ক্ষমতার গুণে এমন একটা অবিন্যস্ত দলকে ম্যাচ জিতিয়ে দেওয়া। এলোমেলো রীতিনীতির মধ্যে তাই পেলেকে আমেরিকার মাঠে বড় অসহায় বলে মনে হয়েছে সকলের এবং তা মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে পড়ে গেল—তা হলো পেলের বিরুদ্ধে গোপন শত্রুতার কথা। যে মানুষ যত বড় হয়, তার পিছনে ততো বেশী গোপন শত্রু থাকে—কথাটা একবারে মিথ্যে নয়। পেলেকে নিয়ে নোংরা রাজনীতি করতে এর আগেও আমরা বহুবার দেখেছি। দেখেছি পেলের অপপ্রচারে বৃটিশের প্রচার যন্ত্রের সক্রিয় ভূমিকাকে। সেই রোষাগ্নি কিন্তু আজো নির্বাপিত হয় নি। এখনো পেলেকে ঘিরে চলেছে ফুটবলের সেই গোপন শত্রুতা।

কথাটা কেন উঠলো বলি, কিছুদিন আগে কসমসের এক খেলায় রেফারি গিলেরমো ভেজাজকুজ খেলা শুরুর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পেলেকে মাঠ থেকে বার করে দিলেন। ব্যাপারটা সেদিন যারা চোখে দেখেছিলেন, তারা সকলেই বলেছেন, এতটা বাড়াবাড়ি করা রেফারির ঠিক হয় নি। এ যেন লঘু পাপে গুরুদণ্ড দেওয়া। এমন কোন মারাত্মক ধরনের ফাউল ছিল না যে মাঠ থেকে পেলেকে বার করে দিতে হবে। অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি সেদিন পেলে না হয়ে অন্য কেউ হতেন তাহলে হয়তো এতটা বাড়াবাড়ি করতে দেখা যেত না রেফারি ভদ্রলোককে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বোগোটায় শুরু হলো তুলকালাম কাণ্ড। দর্শকেরা খেলা ভুলে শুরু করে দিলেন রেফারির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে খেলা চালানো অসম্ভব হয়ে উঠলো রেফারির পক্ষে। দর্শকদের দাবী—খেলা যেমন চলছে তেমনি চলুক, কেবল পেলেকে মাঠে নামতে দেওয়া হোক, সেইসঙ্গে বদল করা হোক কুচক্রী রেফারিকে। শেষ পর্যন্ত জনমতের চাপের কাছে নতিস্বীকার করতে

বাধ্য হলেন লীগ কমিটি। তারা রেফারি বদল করে মাঠে নতুন এক রেফারিকে নামালেন,—সেইসঙ্গে পেলেকেও।

তবু বলি, আজ যে পেলেকে ঘিরে কসমস ক্লাব কর্তাদের মৃদু গুঞ্জন উঠেছে, তা অত্যন্ত দুঃখের। একথা ভাবলে কষ্ট হয়, বিশ্বের সেরা ফুটবলারকে কি না শুনতে হচ্ছে অভাবনীয় সব মন্তব্য। কসমসের একজন কর্মকর্তা বলেছেন—"এ-হোল-ইন-দ্যা-এয়ার" অন্য একজনের উক্তি—"ক্লাব এখন একজন মৃত খেলোয়াড়ের সৎকারে ব্যস্ত।" কসমস দলের একজন সহ খেলোয়াড় পেলে প্রসঙ্গে বলেছেন; "ওয়ার্স্ট-প্লেয়ার-ইন-দ্যা-ফিল্ড।"

উপরোক্ত উক্তির দিকে চোখ রাখলে, আমাদের কি বিস্মিত হতে হয় না? অবাক হয়ে ভাবতে হয় না, হায়রে ফুটবল,—এটা কি তোমার যোগ্য প্রেমিকের শেষ পুরস্কার। একদিন না তুমি তাকে পরিয়ে দিয়েছিলে বিশ্বের সেরা ফুটবলারের মুকুট, তুমিই তাকে করেছিলে রাজার রাজা।

দিন যায়।

যায় বুঝি এই ভাবে—প্রেমিকের মনে পড়ে ফেলে আসা সোনালী স্বপ্নের দিনগুলোর কথা। ব্রেজিলের মানুষ বেদনাহত চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে—তিনি তাদের স্বপ্নের রাজা।

হে ফুটবল—আমি কি সত্যি শেষ হয়ে গেছি। সত্যি কি আমি হয়ে উঠেছি দলের বোঝা! আর কি আমার কিছু দেওয়ার নেই—আমি কি মৃত?

মনে পড়ে কত কথা, কত স্মৃতি। চোখের ওপর ভেসে ওঠে বিশ্বকাপ ফাইনালের কথা।

কোয়ার্টার ফাইনালে পেরুকে ৪-২ গোলে হারালো ব্রেজিল। সেমিফাইনালে লড়তে হলো উরুগুয়ের সঙ্গে। দুরন্ত সে এক ফুটবল। তবু সেই দুরন্ত ফুটবলের মধ্যে অপর্যাপ্ত প্রাধান্য নিয়ে ৩-১ গোলে ম্যাচ জিতলো ব্রেজিল দল। পেলের বাড়ানো থ্রু থেকে প্রথম

গোল করলেন ক্লোডালডো, দ্বিতীয় ও তৃতীয় গোল এলো যথাক্রমে জেনার ও রিভেলিনোর পায়ে ছুঁয়ে। তারপরই বসলো জুলে রিমের ফাইনালের আসর—বিপক্ষে ইতালি। মনে পড়ে। মনে পড়ে যায়। গোটা মেক্সিকো সিটি ঘিরে সেদিন বসেছিল বিশ্ব ফুটবলের এক বর্ণাঢ্য আয়োজন। কাতারে কাতারে মানুষ। সেকি তাদের প্রাণ-খোলা উল্লাস। পরনের পোশাক ছিন্নভিন্ন—বিবস্ত্র। তবু সেদিকে কারো কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। ওই বিবস্ত্র অবস্থায় পেলেকে কাঁধে নিয়ে গোটা মাঠময় খেলা-পাগল মানুষের দল করে চলেছে উল্লাস, নৃত্য। এ বন্ধনহীন, চির মুক্তিদিবস যেন।

মহান ফুটবলারের চোখের উপর ভেসে ওঠে সেদিনের স্মৃতিময় দিনের কথা। জুলে রিমে কে পাবে—ব্রেজিল না ইতালি? এই খেলায় যে জিতবে তারি গলায় জুলে রিমে পরিয়ে দেবে জয়মাল্য।

বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো উত্তেজনা। গোটা খেলায় পেলে প্রমাণ রাখলেন তার শ্রেষ্ঠত্বের। শিল্পী সম্মত ভঙ্গিমায় সেদিন তার খেলা ছিল দেখার মতো। যেমন নিখুঁত পাসিং, তেমনি আত্ম-প্রত্যয় ভরা বল কনট্রোল। গোটা মাঠে মানুষটা বল নিয়ে ছুটে বেড়ালেন, অথচ স্পর্শ করলেন না কাউকে।

খেলার শুরুতে অবশ্য চেপে ধরেছিল ইতালি। কিন্তু এই চাপ ক্ষণিকের। সাত মিনিট পার হতে না হতেই বদল হলো চিত্র। পিকাশোর ভাস্কর্য ভঙ্গিমায় স্বমূর্তিতে আবির্ভূত ফুটবল দেবতা চলতি বলে মাথা ছুঁয়ে করলেন প্রথম গোল। পেলের দেওয়া গোলে এগিয়ে গেল ব্রেজিল। খানিক পরেই ইতালির স্ট্রাইকার বনিন-সেগ্না দুরূহ কোণ থেকে করে বসলেন একটি দর্শনীয় গোল। বিরতির সময় খেলার ফলাফল দাঁড়ালো সমান সমান। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে খেলা শুরু হতে না হতেই ব্রেজিল তার শিল্প সম্মত আক্রমণের সুবিন্যস্ত ধারায় ক্ষত-বিক্ষত করে তুললো ইতালিকে। ছোবলের পর ছোবল মেরে তারা আক্রমণের দুরন্ত চাপে বিধ্বস্ত করে তুললেন ইতালির রক্ষণসীমানার পাথুরে প্রাচীর। পেলে, গারসন,

জেয়ার, অ্যালবার্টো বাদ গেলেন না কেউ। আক্রমণের গোছানো ধারার মুখে ইতালি দল অচিরেই ভেঙে পড়লো। আর তাদের সেই ভেঙে পড়া প্রাচীরের দুর্বল ভিত ভাসিয়ে ব্রেজিল দল নব উচ্ছ্বাসে প্রবাহিত করলো নিজেদের ক্রীড়াশৈলীর প্রাধান্যতা। দুরন্ত চাপের ভেসে গেল ইতালি দল। পেলের বাড়ানো বল থেকে প্রথমে গারসন ও পরে জেয়ার একটি করে গোল করলেন। খেলা শেষ হওয়ার খানিক আগে দলের হয়ে গোলের অঙ্ক বাড়ালেন অ্যালবার্টো। ৪-১ গোলে ফাইনালে জিতলো ইতালি, ঘরে নিয়ে এলো জুলে রিমেকে।

সে একটা দিন গিয়েছে। সবাই এসেছে, নৃত্য করেছে ফুটবল প্রিয় মানুষ তাকে ঘিরে। ব্রেজিল বলেছে—তুমি আমাদের রাজা—রাজার রাজা—নববসন্তের সম্রাট।

থাক স্মৃতির কথা। স্মৃতি সতত সুখের! ফুটবল প্রিয় মানুষেরা চিরকালই আমায় ভালোবাসে—ভালোবেসেছে। আমি তাদের ভালোবাসার কাছে ঋণী।

মনে পড়ে স্যাণ্টোসের হয়ে কলম্বিয়াতে এক প্রদর্শনী ম্যাচ খেলার কথা। এই ম্যাচে আমাকে বেশ কয়েকবার অন্যায়ভাবে মারা হলো। রেফারি নিরুপায়। এরপর আমার বুকের ওপর পা তোলা হলে আমি রেফারির কাছে প্রতিবাদ করলাম। রেফারি আমাকে খেলা চালিয়ে যেতে বললেন। আশ্চর্য! লোকটা কি অন্ধ নাকি? তার চোখে কি কিছুই পড়ছে না? আমি এবার চটে গেলাম। রেফারির সঙ্গে শুরু হলো উত্তপ্ত ভাষায় তর্কবিতর্ক। ফলে রেফারি ভদ্রলোক মেজাজ হারিয়ে আমাকে লাল কার্ড দেখালেন। লাল কার্ড দেখানো মাত্র আমি আর দাঁড়ালাম না। সোজা চলে এলাম মাঠ ছেড়ে। দর্শকেরা চিৎকার শুরু করলেন। আমার চোখ ফেটে জল নেমে আসছে—কি অপমান! এমন অপমানিত আমি কখনো হইনি। রেফারির সঙ্গে তর্ক করা বা তার বিরুদ্ধাচারণ করা আমার স্বভাব নয়। অন্তত ১৯৬৬ সালে ইংল্যাণ্ডের মাঠে যখন আমায় প্রহারে

প্রহারে জর্জরিত করা হয়েছিল তখনও আমি কোন কথা বলিনি। নীরবে মাঠ ছেড়েছি। সহ্য করছি আঘাতের যন্ত্রণা। কিন্তু এই ক্ষেত্রে রেফারি আমায় লঘু পাপে গুরুদণ্ড দিলেন। লাল কার্ড দেখানোর পর আর আমার মাঠে থাকা উচিত নয়—অতএব আমি কোন কথা না বলে সোজা চলে এলাম ড্রেসিংরুমে।

মাঠের চেহারা তখন সঙ্গীন। ইট পাথরের টুকরো পড়তে শুরু করেছে। রেফারির উদ্দেশ্যে শুরু হয়েছে গালমন্দ। খেলা প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম। হঠাৎ দেখতে পেলাম একজন কর্মকর্তা ছুটতে ছুটতে ড্রেসিংরুমে প্রবেশ করলেন। মুখ চোখে উৎকণ্ঠা।

—কি ব্যাপার ?

—তোমায় মাঠে নামতে হবে পেলে ?

—মাঠে নামতে হবে, বারে আমাকে তো রেফারি মাঠের বাইরে বার করে দিয়েছেন।

—তা সত্যি, তবে রেফারিকেও আর মাঠে থাকতে দিতে চাইছেন না দর্শকেরা। তারা তোমায় চায়। তুমি মাঠে নামো। এমন একটা সুন্দর খেলা আশা করি তুমি নষ্ট করতে চাও না।

বুকের ভিতরটা দুলে উঠলো। দর্শকেরা আমায় চায়। হ্যাঁ পেলে, একবার তাকিয়ে দেখ মাঠের দিকে।

সত্যি—তাকিয়ে দেখতে পেলাম মাঠের মধ্যে তখন তাণ্ডব চলেছে। এই অবস্থায় আমি না নামলে বিপদ অনিবার্য, অতএব নেমে পড়লাম।

এমন ঘটনা পৃথিবীর ফুটবলে আর দ্বিতীয়টি ঘটেছে কিনা আমার জানা নেই—তবে আমার জীবনে এমন অভিজ্ঞতা আর নেই। আমি মাঠে নামলাম। মাঠ আবার শান্ত হলো।

এই প্রসঙ্গে আবার বলি ১৯৭৪ সালের কথা। আমি দলের সঙ্গে নেই। যদিও সে বছর বিশ্বকাপেও ব্রেজিলের মানুষ চেয়েছিল আমাকে দলের সঙ্গে থাকতে। তাদের ধারণা ছিল পেলে দলে থাকলে ব্রেজিলকে হারানো সম্ভব নয়। কিন্তু আমি রাজি হলাম না। জাতীয়

দলে প্রতিনিধিত্ব করার বয়স আমার আর নেই—নেই সেই তেজ, গতি ও দৃষ্টিশক্তি। তবু বহু জায়গা থেকে বহু লোক আমায় টাকার লোভ দেখিয়েছিলেন।

১৯৭৪ সালে আমি পশ্চিম জার্মানীতে ভি. আই. পি. আসনে বসে খেলা দেখেছি। বেতারে আমাকে মন্তব্য রাখতে ডাকা হয়েছিল।

ব্রেজিলের প্রথম খেলা।

আমি মাঠে এসেছি শুনে দর্শকেরা হৈ হৈ করে উঠলেন। তাদের দাবী পেলেকে একবার মাঠে নামতে বলা হোক। মানুষকে আমি চিরকাল ভালোবাসি—তাই পারলাম না সেই আন্তরিক দাবীকে অগ্রাহ্য করতে। বল নিয়ে বিরতির সময় নামলাম মাঠে। দর্শকেরা হৈ হৈ করে উঠলেন। পরনে স্যুট পরা অবস্থায় আমাকে জার্মান সমর্থকদের দেখাতে হলো সার্কাস-খেলোয়াড়ের মতো ফুটবলের জাদুবিদ্যা। ডানপায়ে বল তুলে সেই বল হাটু, কাঁধ, মাথা ছুঁয়ে একই কায়দায় ব্যালেন্সের সাহায্যে নামিয়ে আনলাম আমার বাঁ পায়ে।

করতালিতে ভরে গিয়েছিল সারামাঠ। সবাই বলেছিলেন—পেলে, দ্য-গ্রেট-ফুটবলার-ফর-অলটাইম।

পেলে—ইয়াসিন মুখোমুখি

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় কে? এই পর্যায়ের ভোটে সোভিয়েতের গোলরক্ষক ইয়াসিন পেলের কাছে মাত্র এক ভোটে হেরেছিলেন। পেলে তার জীবনে দেখা সেরা গোলরক্ষার কথা বলতে গিয়ে বারবার প্রশংসা করেছে ইয়াসিন এবং গর্ডন ব্যাঙ্কসের।

ইয়াসিন-পেলে সর্বপ্রথম মুখোমুখি হয়েছিলেন ১৯৫৮ সালে। পেলের প্রথম ম্যাচ। বিশ্বকাপে সেই তিনি প্রথম খেলতে নেমে-ছিলেন। এই ম্যাচে ইয়াসিনকে পেলে ভেদ করতে পারেন নি—

তাকে পরাস্ত করেছিলেন বহু পরে ১৯৬১ সালে লেনিন স্টেডিয়ামের এক খেলায়।

১০ই এপ্রিল।

সোভিয়েতের গোলপোস্ট আগলে দাঁড়িয়ে আছেন ইয়াসিন। পেলের পায়ে বল। পেলে জানতেন ইয়াসিনকে ভেদ করা সহজ নয়। তিনি দুর্ভেদ্য! তবু চেষ্টার ত্রুটি নেই। দশ মিনিটের মধ্যেই ইয়াসিন দু' দুবার নিশ্চিত গোলরক্ষা করলেন গ্যারিঞ্চার পা থেকে। অনবদ্য গ্যারিঞ্চা আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও গোল পেলেন না। পেলের থ্রু পাস গ্যারিঞ্চা সোয়ার্ভ শট করলেন। বল বাতাসে বাঁক নিয়ে গোলে প্রবেশ করার মুখে ইয়াসিন ঝাঁপিয়ে পড়ে বাজপাখির মতো শূন্যে লাফিয়ে লুফে নিলেন। এরপর পেলে প্রথম নিলেন আক্রমণের ভূমিকা। গ্যারিঞ্চার ক্রশ সেণ্টার বুকে নিয়ে পেলে ছুটে গেলেন সোভিয়েত গোলমুখে। সামনে দুজন ডিফেনডার। পেলে পায়ের টানে সামনের একজনকে টপকে গিয়ে বলটিকে এমন ভাবে টোকা মারলেন যে দ্বিতীয় জনের গায়ে বল লেগে আবার তা ফেরত এলো তারই পায়ে। এবার তার সামনে একবারে ফাঁকা জমি। পেলে সেই বল নিজের আয়ত্তে না নিয়ে হিল করে পৌঁছে দিলেন গ্যারিঞ্চাকে। গ্যারিঞ্চা উইং ধরে ছুটে গিয়ে পেলের গতি লক্ষ্য করে নিখুঁত সেণ্টার করলেন। বল বাতাসে বাঁক নেওয়ার আগেই পেলের মাথা ছোঁয়ানো উচিত ছিল। অন্য কেউ হলে তাই করতো। কিন্তু পেলে তা করলেন না। বরং তিনি বলটিকে বাতাসে বাঁক নিতে দিলেন। তাঁর ধারণা ছিল ইয়াসিন হয়তো সেই মুহূর্তে পরাস্ত হবেন। কিন্তু চতুর ইয়াসিন বলের ওপর নজর রেখে ছেড়ে দিলেন—শুধু তাই নয় দ্রুত সরে এলেন এমন একটা জায়গায়, যেখানে দাঁড়িয়ে পেলের চকিতে করা হেড ধরতে তার কোন অসুবিধে হলো না।

পেলে নিজেও স্তম্ভিত হলেন।

আশ্চর্য—ইয়াসিন যে এত দ্রুত জায়গা নিতে পারবেন এই ধারণা তাঁর ছিল না।

আবার তাই তিনি অপেক্ষায় থাকলেন সুযোগের। খানিক বাদে গ্যারিঞ্চা গড়ানো পাস দিলেন। পেলে ছুটে গিয়ে সেই বল ধরে প্রথমে সরে গেলেন ডানদিকে, তারপর কোনরকম দ্বিধা না করে অদ্ভুত কায়দায় শরীর মোচড় মেরে চকিতে নিলেন বাঁ পায়ের জোরালো শট। বল বাতাসে বাঁক নিয়ে পোস্টের কোণ ঘেঁষে জালে জড়িয়ে গেল। ইয়াসিনের দুর্ভাগ্য তিনি শরীর ছুঁড়ে দিয়েও অল্পের জন্য সেই বলের নাগাল পেলেন না।

এইদিন পেলেকে যেন দৈবশক্তিতে ভর করেছিল। দ্বিতীয় গোল দিলেন বাইসাইকেল শটে। ইয়াসিন কোন কিছু বোঝার আগেই বল জড়িয়ে গেল জালে। এই ম্যাচ প্রসঙ্গে পেলে বলে-ছিলেন, "লেভ গোলে না দাঁড়িয়ে যদি অন্য কেউ এই ম্যাচে গোলে দাঁড়াতো তাহলে এক ডজন গোল করা ব্রেজিলের পক্ষে অসম্ভব ছিল না।"

তবে পেলের ধারণায়, ইয়াসিনের চাইতেও ইংল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কসের তৎপরতা আরো বেশী। ব্যাঙ্কস শরীরকে এমন ভাবে গড়েছেন, তিনি পারেন যে কোন অবস্থায় যে কোন দিকে শরীরকে ছুঁড়ে দিতে। তাকে বুদ্ধিতে হারানো খুবই কঠিন।

১৯৭০ সালের বিশ্বকাপের পুল লীগের খেলায় পেলে প্রাণপণ চেষ্টা করেও গর্ডন ব্যাঙ্কসকে পরাস্ত করতে পারেন নি। বরং শেষ মুহূর্তে ব্যাঙ্কসের অনমনীয় দৃঢ়তার সামনে তিনি আত্মবিশ্বাসকে সংকুচিত করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

টোস্টাও'য়ের সেণ্টারে মাথা ছুঁয়ে পেলে চিৎকার করে উঠলেন— গোল!

শুধু তিনি একা নয়, তার সঙ্গে অগণিত সমর্থকেরাও হৈ হৈ করে উঠলেন। কিন্তু সবাই অবাক। ব্যাঙ্কস পেলের জোরালো হেডকে অকল্পনীয় ভাবে ফিরিয়ে দিয়েছেন। এমন একটা হেডকে রক্ষা করার জন্য ব্যাঙ্কস যে শেষ মুহূর্তে শরীর একদিক থেকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে দিতে পারবেন, এই বিশ্বাস তার ছিল না। এই ম্যাচে

ইংল্যাণ্ড হেরেছিল বটে—তবে তা পেলের গোলে নয়। গোল দিয়েছিলেন জিয়ারজিনো।

পেলের কথাই মনে হয় ঠিক—ফুটবল একজনের খেলা নয়। এই খেলা হলো দলগত খেলা। যদি তা না হবে তাহলে পেলে দলে থাকতে কসমস ব্যর্থ হবে কেন। তার দেওয়া একের পর এক পাস ব্যর্থ হলো। তিনি বল ড্রিবল করে নিয়ে গিয়েও গোল করাতে পারলেন না। গোলে শট নেবে এমন কেউ নেই দলে। টরেন্টো মেট্রোসের সঙ্গে খেলায় পেলে সারা মাঠ জুড়ে খেললেন। একের পর এক সুযোগ সতীর্থরা নষ্ট করায় শেষে তিনি নিজেই হয়ে উঠলেন গোলের জন্য মরিয়া। চল্লিশ গজ দূর থেকে নিলেন দুরন্ত শট। দুর্ভাগ্য পেলের—ওই ভারি ওজনের শট বারপোস্ট কাঁপিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। পেলের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও কসমসকে হারতে হলো এই ম্যাচে। ফলে তিনি হয়ে পড়লেন বিতর্কিত।

অবাক হয়ে ভাবতে হয়, একদিন যে মানুষটাকে ঘিরে ছিল বিশ্ব-ফুটবলের এত উন্মাদনা, আজ সেই তাকে ঘিরেই কি না এত সমালোচনা। ভাবতে গিয়ে চোখে জল এসে যায়। কে যেন বলে, তবে কি তুমি সত্যি ফুরিয়ে গেছ রাজা, শেষ হয়ে গেছ।

পেলেকে ঘিরে এই প্রশ্নের সঠিক এক উত্তর দিয়েছেন কসমস ক্লাবের একজন অন্যতম সদস্য। তিনি পেলের ক্রীড়ানৈপুণ্যের মাদকতাকে অবহেলন করে সোচ্চারে বলেছেন, "কসমসের ব্যর্থতার জন্য কিছুতেই পেলেকে দায়ী করা যায় না। আমার মনে হয় খেলার গুণগত নিরিখে পেলে আজও পেলেই আছেন। তাকে দলের অপটু ফুটবলারদের পাশে জায়গা বদলে খেলতে হবার জন্য, তিনি আগের মতো খেলায় আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছেন না। খেই হারিয়ে ফেলছেন।"

কথাটা মিথ্যে নয়।

পেলে আজো পেলে। যদি তা না হতো তাহলে কি ওমন একটা গোল করা সেদিন সম্ভব হতো কসমসের হয়ে। পেলের নিজের

ভাষায়, "৭৬' এর ৮ই অক্টোবর তারিখে নিউইয়র্কের যে গোলটি আমি করেছিলাম—তা আমার জীবনে একটি সেরা গোল। গোল করেছিলাম মিয়ামি দলের বিরুদ্ধে বাইসাইকেল কিকে। জীবনে অনেক ভাল গোল করেছি, কিন্তু এত তৃপ্তি, এত আনন্দ আর কখনো পাইনি। বারবার মনে হয়েছে আমি আমেরিকার মাঠে দেখাতে পেরেছি আমার সেরা খেলার একটা দর্শনীয় নজির—।"

৭৬'রে কসমস লীগ পর্যায়ের খেলায় ব্যর্থ হলেও—৭৭-'রে তারা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে দলের গুণগত বিচারে সার্বিক সফলতা। দল হয়েছে মরশুমে সকার চ্যাম্পিয়ান। এই চলতি মরশুমে অবশ্য দলে একা পেলে নেই, আছেন জার্মানীর যৌবন উদ্ধত পুরুষ ফ্রানজ বেকেনবাউয়ার, আছেন ইতালির ক্লিনাক্লিয়া সেই সঙ্গে দলে এসেছেন ব্রেজিলের আর এক কালো মানিক।

সব মিলিয়ে কসমস এখন পরিপূর্ণ। আমেরিকার ফুটবল ইতিহাসের দিক দিয়েও বছরটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বিশ্ববরেণ্যদের এমন প্রদর্শনী মেলা এর আগে কখনো আমেরিকার সকারে ঘটেনি। আর চলতি মরশুমে শুধু যে কসমসের সাফল্য এসেছে তাই নয়, সেই সঙ্গে ধরা পড়েছে পেলের মনোমুগ্ধকর ভাস্কর্যের প্রদীপ্ত বিকিরণ। ৭৭" এর ২০শে জুন তারিখে মেডোল্যাণ্ডে কসমস তার নতুন স্টেডিয়াম মাঠে পরাজিত করেছে গতবারের দুর্ধর্ষ দল টম্পাবে দলকে। এই ম্যাচে পেলের ভূমিকা ছিল অনন্য। আমেরিকার মাঠে তিনি রাখলেন নয়নাভিরাম দৃশ্যের নজির। তার দেওয়া তিন-তিনটি গোলে দল জিতেছে ৫-৩ গোলের ব্যবধানে। আমেরিকার মানুষ দুচোখ ভরে দেখেছে সেই অভাবনীয় এক শিল্প গরিমা। পায়ে বল নাচিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন—আমি পেলে—সেই পেলে, ফুটবলের রাজা।

টকটকে লাল ইটের গ্যালারী—মাথার ওপর উদার নীল আকাশ আর মাঠের সবুজ নিকেতনে ফুটবলের রাজার পদচারণার মাদকতা —সব মিলিয়ে সেই দিনটা ছিল আমেরিকার ফুটবল জগতের এক মহেন্দ্রক্ষণ। মাঠে তিল ধারণের জায়গা নেই। যে আমেরিকায় একদিন

শূন্য স্টেডিয়ামে ফুটবল চলতো, সেই মাঠেই সমবেত হতে দেখা গেল ৬৪ হাজার দর্শককে। তাদের সকলের লক্ষ্য—পেলে—পেলে। এক সময় বিউগল বেজে উঠলো। দেখা গেল সাইড-স্ক্রীন জুড়ে—একটি মানুষের মুখ। দর্শকেরা হয়ে উঠলেন উদ্বেল।

মাঠে নামলেন পেলে।

কালো রঙের শক্ত পেটানো চেহারা। একশো পঁয়ষট্টি পাউণ্ড ওজনের ৫´৯´´ ইঞ্চি উচ্চতার মানুষটি এসে দাঁড়ালেন নিজের জায়গায়। পাশে সঙ্গী ৬´২´´ ইঞ্চি উচ্চতার ক্লিনাক্লিয়া, আর ফুটবলের যৌবন উদ্ধত যুবরাজ "কাইজার ফ্রন্‌জ"।

প্রথম দানে টম্পাবে দল বেশ জোরদার হয়ে চেপে ধরলেন কসমসকে। কিন্তু দুর্ভেদ্য প্রহরী বেকেনবাউয়ারকে অতিক্রম করা তাদের সম্ভব হলো না। কাইজার একা—মিডফিল্ড সুইপার। ৭৪ সালে এই টম্পাবে দল ছিল সকার চ্যাম্পিয়ান। ১৯৭৫ সালের প্রথম খেলায় কসমস হেরেছিল ৩-১ গোল। ৭৬-রে কসমস আবার হেরেছিল ১-০ গোলে। এবার ফিরতি খেলায় সেই টম্পাবে দলকে পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়ে কসমস হারালো ৫-৩ গোলে। ম্যাচের এই ফলাফল সত্যিই কসমসের দলগত সংহতির দিক দিয়ে অনেক বেশী মূল্যবান। খেলার প্রথমেই টম্পাবে দল একের পর এক গোল দিয়ে এগিয়ে গেল। কসমসের পক্ষে প্রথম গোল এলো পেলের ডান পায়ের জোরালো শট থেকে। জটলা থেকে বেকেনবাউয়ার বল ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে এগিয়ে দিলেন হাণ্টকে। হাণ্ট থেকে ক্লিনা-ক্লিয়া। ক্লিনাক্লিয়া চলতি বল বাড়িয়ে দিলেন পেলেকে। আর ওই বলেই ছুটন্ত অবস্থায় ২০ গজ দূর থেকে পেলে নিলেন দুরন্ত শট। এই গোলের ফলেই পেলের জীবনে পূরণ হলো ১২৬৬ নম্বর গোল। গোল হতেই ক্লিনাক্লিয়া ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন পেলেকে।

বিরতির পর কসমস শুরু করলো দুরন্ত খেলা। মাত্র মিনিট পাঁচেকের মধ্যে বেকেনবাউয়ারের বাড়ানো বলে পেলে দিলেন দ্বিতীয় গোল। এরপর দৃশ্যমান হলো সেই চোখ ধাঁধানো মনোমুগ্ধকর ভাস্কর্য-

দীপ্ত, ডেডলক শটের বিনিময়ে পেলের স্মরণীয় হ্যাটট্রিক। মাঝ মাঠে টম্পা দলের চার জনের কাছ থেকে বল কেড়ে নিয়ে বেকেনবাউয়ার বাড়িয়ে দিলেন ক্লিনাক্লিয়াকে। ক্লিনাক্লিয়া···পেলে···ক্লিনাক্লিয়া··· পেনালটি বক্সের কাছে আসতেই অবৈধ চার্জের বাঁশি বাজালেন রেফারি। ফ্রিকিক। বক্সের বাইরে পিঠে পিঠ লাগিয়ে একটা মস্ত প্রতিরোধ প্রাচীর তুললেন টম্পা দলের খেলোয়াড়েরা। ফ্রিকিক নিচ্ছেন পেলে। গোটা মাঠ স্তব্ধ, চাপা গুঞ্জন। বাঁশি বাজলো—শট করলেন পেলে। বাহ্য প্রতিক্রিয়াহীন পেলে একজায়গায় দাঁড়িয়ে নিলেন ডেডলক শট। মানুষের প্রাচীর টপকে সেই বল ঘুরতে ঘুরতে উঠে গেল উপরে। গোলরক্ষক এগিয়ে এলেন বলের গতি লক্ষ্য করে। লক্ষ্য তার ঠিকই ছিল—কিন্তু হঠাৎ করেই শূন্যে ঘটে গেল এক অভাবনীয় ঘটনা। ঘুরন্ত বল নেমে এলো সোজা হয়ে, দ্বিগুণ গতিতে। তারপর সবাই দেখল বল গোল লাইনের আগে পড়ে ঢুকে যাচ্ছে গোলের মধ্যে। চিৎকারে ডুবে গেল মাঠ। বেকেনবাউয়ার ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন পেলেকে। পেলে পূরণ করলেন তার অনবদ্য ডেডলক শটে নিজের হ্যাটট্রিক।

সেদিনের খেলা শেষে সবাই বুঝেছেন পেলে কি এবং তার সহজাত বৈশিষ্ট্য। তার সেদিনের দর্শনীয় খেলা আমেরিকার ফুটবল উৎসাহী মানুষের চোখে স্মরণীয় হয়ে থাকবে দীর্ঘদিন। এই ম্যাচের পরই—খবরের কাগজের প্রথম পাতায় বিরাট হেডিং দিয়ে প্রকাশিত হলো সেই ঘটনার প্রত্যক্ষ বিবরণ। ম্যাচ শেষে ক্লাবের ট্রেনার পেলেকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমার স্থির বিশ্বাস পেলে এখনও বিশ্বসেরা—সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবলার।'

পেলের চোখে আমেরিকা

কসমসের সঙ্গে পেলের চুক্তি তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। শোনা যাচ্ছে, আবার হয়তো নতুন করে চুক্তি হবে। সত্যি কি ? পেলেকে প্রশ্ন করা হলো : আপনি নাকি আবার চুক্তিবদ্ধ হচ্ছেন ?

উত্তরে বললেন পেলে : উঁহুঃ কথাটা ঠিক নয়। আমেরিকায় থাকছি, তবে খেলোয়াড় হিসাবে কসমসে নয়। এখন আমি নাগরিক হিসাবে সাধারণের মতো দিনযাপন করবো।

—কেন, এতে আপনার লাভ কি হবে ?

—লাভ লোকসানের কোন কথা ভাবছি না। আমি এই সব ভেবে আমরিকায় আসিনি। আমি এখানে এসেছিলাম বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে—সে উদ্দেশ্য আমার সফল হয়েছে।

কি উদ্দেশ্য ?

আমেরিকান ফুটবল। আমি চেয়েছিলাম আমেরিকার মানুষ ফুটবলকে ভালোবাসুক, ফুটবল উৎসাহী হোক,—তারা সত্যি তা হয়েছে। এদের উঁচুমানের যোগ্যতা আছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো এদের উৎসাহ—সত্যি প্রশংসার যোগ্য। আমার বিশ্বাস যদি তারা এই উৎসাহ ঠিকমতো বজায় রাখতে পারে তাহলে আগামী দশবছরের মধ্যে তারা আন্তর্জাতিক ফুটবলে বড় জায়গা নিতে পারবে। বিশ্বকাপ জয় করাও শক্ত হবে না।

ফুটবলে যে আমেরিকানরা ভাল হতে পারে, তার মস্ত কারণ হলো তাদের উৎসাহ, আন্তরিকতা এবং তাদের শরীর চর্চার প্রতি গুরুত্ব। সাধারণ শিক্ষার মতো তারা শরীর চর্চাকেও সহজ ভাবে গ্রহণ করেছে। তাদের জীবনের সঙ্গে মিশে আছে স্পোর্টসম্যানশিপ —কাজেই শরীর মজবুত হওয়ার জন্য তাদের পক্ষে ফুটবলের দায়িত্ব নেওয়া কঠিন হবে না।

হয়তো অনেকের ধারণা হতে পারে, আমি অর্থ সংগ্রহ করার জন্য আমেরিকায় এসেছি। এটাই আমার প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু আদপে তা নয়—ঈশ্বরের কৃপায় অর্থ আমি প্রচুর পেয়েছি। অর্থের প্রতি মোহ আমার নেই। আমার নিজের দেশ ব্রেজিল আমাকে যা দিয়েছে, তার সিকি ভাগও আমেরিকা আমায় দিতে পারবে না। তবু আমি আমেরিকাকে ভালোবেসেছি এর কারণ, তারা ফুটবলকে ভালোবেসেছে বলে। আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। তারা উৎসাহী হয়েছে ফুটবলের প্রতি। এছাড়া আমেরিকায় বাস করে আমারও ভবিষ্যৎ কিছু কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। ফুটবলের মতো এখানকার জীবন বড় গতিময়—এখানে এসে আমি এক সত্যিকার জীবনকে উপলব্ধি করতে পেরেছি। আমি চাইছিলাম ফুটবল থেকে সরে গিয়ে নতুন কিছু করতে। কিছু একটা নতুন করে শিখতে। তাই আমেরিকা থেকে যখন নিমন্ত্রণ এলো, উপেক্ষা করতে পারলাম না। মহৎ একটা উৎসাহ বুকে নিয়েই চলে এলাম আমেরিকায়। এখানে ফুটবল খেলছি, ফুটবলে উৎসাহ দিচ্ছি, সেই সঙ্গে শিখছি ভবিষ্যৎ জীবন চালনার এক নতুন শিক্ষা। ব্যবসা সংক্রান্ত শিক্ষা আমেরিকানদের কাছে শেখা সকলেরই উচিত। আমি শিখছি—শুধু তাই নয় সেই সঙ্গে আরও করছি চলচ্চিত্র পরিচালনার শিক্ষা ও প্রযোজনার কৌশল। ইচ্ছে আছে ভবিষ্যতে একটা ছবির পরিচালক হবার। হবে কি না জানি না। তবে স্বপ্ন সফল করতে শিক্ষার ত্রুটি রাখছি না কোন।

ফুটবলে নতুন কিছু দেয়ার ইচ্ছে আমার নেই। ১৯৭৫ সালের পর ঠিক করেছিলাম, আমার আর পেশাদারী ফুটবল প্রাঙ্গণে থাকা উচিত নয়। আমার ফুটবল জীবনে ছেদ পড়েছে। কিন্তু তা আর হলো না। আমেরিকায় চলে আসতে হলো নতুন কর্তব্যের ঝুঁকি কাঁধে নিয়ে। ফুটবলের প্রসার সংকল্প উদ্দেশ্যেই আমেরিকায় আসা—আজ তা সফল হতে চলেছে—এখন আর নয়। এই শেষ। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। তিনি আমাকে দিয়ে আমেরিকায় ফুটবল প্রসারের

কাজটুকু করিয়ে নিতে পেরেছেন। আগে মাঠে লোক হতো না, খালি মাঠেই ফুটবল চলতো। আজ সেই মাঠেই জমায়েত হতে দেখেছি লক্ষাধিক উৎসাহী দর্শকদের। কসমসকে ধন্যবাদ, তারা আমায় এই সুযোগ এনে দিয়েছেন—সেই সঙ্গে আমাকেও উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছে এক নতুন কর্ম প্রেরণায়। আমেরিকা এখনই ছেড়ে চলে যাওয়ার বাসনা আমার নেই। আমার ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখছে—তারা লেখাপড়া শিখে মানুষ না হয়ে ওঠা পর্যন্ত আমাকে আমেরিকায় থাকতে হবে। তা ছাড়া আমিও কিছু কাজ শিখছি। এতদিন ফুটবল খেলার পর ওয়ার্নার কম্যুনিকেশানের সঙ্গে এক নয়া চুক্তিতে কাজ করতে বেশ ভাল লাগছে। আমার জীবনে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। সবাই এখানে সমান—সবার চোখেই আমি আদরের পেলে। কিং—কিং—টু—এ্যভরিবডি।

এই কদিনেই আমেরিকাকে আমার বেশ ভাল লেগেছে। তারা আমাকে আপন করে নিয়েছেন। দিয়েছেন হৃদয়ের অম্লান আন্তরিক ভালোবাসা। আমি দু'হাত ভরে তাদের আন্তরিক স্নেহ গ্রহণ করেছি। ঈশ্বর করুণাময়—তিনি আমাকে মানুষের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। দিয়েছেন কিছু কঠিন কাজের দায়িত্ব। আমেরিকার প্রতি আমার দায়িত্ব ছিল অনেক—সে দায়িত্ব ছিল ফুটবলের প্রচার এবং প্রসারে। আমি সেই কর্তব্যকে পালন করতে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। যদিও আমার আগে উত্তর আমেরিকার সকার লীগে এসেছেন অনেক নামী দামী ফুটবলার, কোচ—তাদের সমবেত চেষ্টায় ফুটবলের প্রচার পথ অনেকখানি তৈরি ছিল। আমি সেই পথ ধরে আমেরিকার মানুষকে ফুটবলের দিকে অনুপ্রেরিত করে দিয়েছি মাত্র। আমার ধারণা, আমার এই উদ্দেশ্যময় কর্তব্য কিছুটা সফল হয়েছে। আমেরিকায় ফুটবলের প্রতি আগ্রহ বেড়েছে—সবাই চাইছে আমাকে, আমার খেলা দেখতে। কিন্তু আমি—আমিতো আর সেই আগের মতো নেই। অনেক বদলে গেছি। ২২ বছর ধরে ফুটবল খেলে আজ আমি নিঃশেষিত, শেষ হবার মুখে—অথচ অবাক হয়ে যাই, যখন দেখি

আমার প্রেমিকেরা সোচ্চার হয়ে এখনো যখন বলেন, "পেলে কখনও ভুল করেন না, করতেপারেন না।" আমি যখন এই কথা শুনি, তখনই বুঝি দায়িত্ব আমার কত কঠিন। আমাকে ভালো খেলতে হবে—আচ্ছা, তা কি হয়। আমি তো মানুষ, আমি তো তোমাদের মতো একজন। আমার জীবন আছে, সুখ আছে, দুঃখ আছে, মন আছে, মায়া আছে, বেদনা আছে—আছে অভিমান। কিন্তু আমার কোন কথা কেউ কখনও জানতে চায় না। তারা ভাবেন আমি অনন্য—আমি রাজা—আমি ফুটবলের অধীশ্বর। আমাকে যারা ভালোবাসো,—আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলি, আমাকে নিয়ে এত বড় মহৎ ভাবনা তোমরা ভেবো না। মনে রেখ, আমি তোমাদের মতো, তোমাদের মধ্যেরই একজন। ঈশ্বর আমাকে শক্তি দিয়েছেন, আমি সেই শক্তি চালিত এক জন সাধারণ মানুষ মাত্র। এই শক্তি যার দেওয়া, তিনি কৃপা না করলে, আমি তোমাদের কাছে ভাল খেলা দেখাই কি করে বল। মানুষের মধ্যে উদ্যম, অনুশীলন সব নয়—তার বাইরে আছে আর এক মমতাময় পুরুষের অদৃশ্য হাতের নিয়ন্ত্রিত শক্তি—সেই শক্তি যতক্ষণ, ততোক্ষণই আমি। তাই ভুল ভ্রান্তি আমারও হয়, হতে পারে—তোমাদের ধারণা ঠিক নয়। বরং মনে করো পেলেও ভুল করেন, ভুল করতে পারেন তা যে কোন সময়ে।

১৯৭৭ শেষ হয়ে আসছে। এবার আমার বিদায়ের পালা। পেলের ফুটবল শেষ। আর নয়, হলো তো অনেক দিন! এখন আমার সামনে আর এক জীবন, আর এক খেলা—সে খেলা ফুটবলের চাইতেও কঠিন, অনেক বড়—তা হলো সংসার খেলা। এখন আমি আমার সংসার নিয়ে সহজ ভাবে সুখে বেঁচে থাকতে চাই। চাই সন্তানের উপর পিতার কর্তব্য করতে, স্ত্রীর প্রতি পালন করতে স্বামীর কর্তব্য। তাছাড়া আরো কিছু কাজ আছে, তার জন্য নতুন করে লেখাপড়া করছি। ফুটবল থেকে বিদায় নিয়ে কি করবো, তা এখনো ঠিক করে উঠতে পারিনি। আমার সামনে এখন অনেক কিছু ইচ্ছা হাতছানি দিচ্ছে। চলচ্চিত্রের প্রযোজক, গণ-সংযোগ প্রতিনিধি হওয়া,

স্কুল কলেজের ছাত্রদের ফুটবল শেখানো—কি যে শেষ পর্যন্ত করবো ভেবে উঠতে পারিনি এখনো। তবে আমি যা কিছু করবো, তার উদ্দেশ্য হবে ফুটবলকে ঘিরে।

পরিশেষে বলি, এই পৃথিবীতে দরিদ্রের সংখ্যাই বেশী। যেদিকে তাকাই সেদিকেই দেখতে পাই হাহাকার, দারিদ্র্যতা, ক্ষুধার যন্ত্রণা। এই সব দরিদ্র মানুষগুলো তো আমাদেরই একজন।

আমি পেলে—আমার জীবন কৈশোরের দিনগুলো এখনও আমার চোখের ওপর স্পষ্ট। শুনতে পাই বস্তির হাহাকার, মায়ের অভাব, চোখের জলের নীরব কান্না—আমি এখনও পারিনি সেই দিনগুলিকে ভুলে যেতে। তাই তোমাদের বলি, গরীবকে ঘৃণা করো না। স্পর্শ করে দেখ, দেখতে পাবে সেই দরিদ্রজনের মধ্যে তোমাদের ভালবাসার পেলের মতো হাজার পেলে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলছে। তোমরা যে ভাবে আমাকে গ্রহণ করেছ সেই ভাবে গ্রহণ কর তাদের—তাহলেই একদিন না একদিন প্রত্যেকের আন্তরিক স্পর্শে দূর হবে পৃথিবী থেকে দারিদ্র্যতা—মোচন হবে অভিশাপ।

দারিদ্র্যতার জ্বালা তোমরা কি ভোগ করেছ? দেখেছ কি সত্যিকার ক্ষুধা বলতে কি বোঝায়? আমি দেখেছি—আমার রক্তে মিশে আছে দারিদ্র্য নিপীড়িত মানুষজনের অশ্রু—তাই আমার প্রার্থনা—হে ঈশ্বর, তুমি পৃথিবী থেকে দুঃখ দূর কর, অভাব মোচন কর। দারিদ্র্যতার যন্ত্রণা থেকে মুক্ত কর মানুষজনকে। বুভুক্ষু মানুষের বুক ফাটা ক্রন্দন আমি সহ্য করতে পারি না। আমি ওই কান্নার মধ্যে শুনতে পাই আমার কৈশোরের হাহাকার···দেখতে পাই হাজার দরিদ্র মায়ের মধ্যে আমার নিজের মাকে।

বন্ধু, দারিদ্র্যতা পাপ নয়—মানুষই সৃষ্টি করেছে সংসারের দারিদ্র্যতা। অতএব তোমরা যারা আমায় ভালোবাসো, তাদের কাছে অনুরোধ—এস, আমরা এক সঙ্গে পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য কাজ করি, শপথ গ্রহণ করি দারিদ্র্যতা মোচনের—আমাদের মানব কল্যাণ ব্রতই

পারে সংসারের অভাব মেটাতে, সুখ শান্তিতে গড়ে তুলতে পৃথিবীর চেহারা।

আমি চাই না আমার সামনে দাঁড়িয়ে কোন মানুষ চোখের জল ফেলুক—নষ্ট হয়ে যাক কারো প্রতিভা। যদি কেউ ওদের মধ্যে এমন একজন থাকে, যে ফুটবলার হতে চায়—হতে চায় পেলে—তবে জানবেন, আমি তাদের খুব কাছাকাছি আছি। আমার সেবায়, আমার আশ্রয়ে, আমি চাই ফুটবলের বুকে তাদের বড় করে তুলতে, মনুষ্যত্বের অধিকারে প্রতিষ্ঠা করতে।

তবে সমস্ত ইচ্ছের পেছনে আছেন এক ইচ্ছাময় কর্তা। কল্যাণময় সেই সর্বশক্তিমান কবে আমায় এই গুরুদায়িত্ব অর্পণ করবেন জানি না, তবে আমি তার সেই কল্যাণ আদেশের জন্য অপেক্ষা করে আছি—এবং থাকবো।

কলকাতায় পেলে

কলকাতায় পেলে—কথাটা শুনতেও যেন খটকা লাগে। ঠিক প্রথমটায় যেমন বিশ্বাস হয় নি চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের বিচরণের সংবাদ, তেমনি বিশ্বাস করতে মন চায় নি ফুটবলের রাজা পেলে আসছেন কলকাতায়। শুধু আসছেন না—তিনি আসছেন কসমস দলের সঙ্গে এশিয়া ভ্রমণের সর্বশেষ অধ্যায়কে গরিমাসিদ্ধ করতে রূপময় মহানগরী কলকাতায়।

ইডেন সার্থক—ফুটবলের রাজার আবির্ভাবে। তবে এই প্রসঙ্গে ভারতবাসী হিসেবে, কলকাতার মানুষ হিসেবে, ফুটবল প্রিয় দর্শক হিসাবে প্রথমেই সাধুবাদ জানাই কলকাতার মোহনবাগান ক্লাবকে। মোহনবাগান ক্লাবের আমন্ত্রণ রক্ষায় কসমস সহ পেলের কলকাতায় আসা—খেলা।

বলতে দ্বিধা নেই—আন্তর্জাতিক আসরে ভারতীয় ফুটবলের মান

অনেক নিচে। ভারতবাসী যে ফুটবল খেলে বা বোঝে এই বিশ্বাস পৃথিবীর বহু সভ্য দেশের নেই। এই প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দিলেই মনে হয় পাঠকেরা বুঝতে পারবেন। ভারতীয় ফুটবল সম্পর্কে বিশ্বের কি ধারণা। পৃথিবীর সেরা একটি ফুটবল সংকলন—"ফুটবল, এ টু জেড"—নামক গ্রন্থে ভারতীয়দের সম্পর্কে কেবল বলা হয়েছে—"১৯৫০ সালে ফিফার সদস্য'। নীল রঙের জার্সি, সাদা প্যান্ট—।'—ব্যাস এর অতিরিক্ত আর কিছু নয়। এবার বুঝুন ভারত সম্পর্কে বিশ্বজনের যেখানে এই ধারণা, সেখানে পেলে এসেছেন—এসেছেন ফুটবল খেলতে, একি কম গৌরবের কথা নয়।

ভারতবর্ষ সম্পর্কে মহান ফুটবলারের উক্তি—"ভারত যাত্রা আমার কাছে তীর্থযাত্রার সামিল। জ্ঞানোদয় থেকে ভারতের অধ্যাত্মবাদ, ভারতীয় মনীষীদের জীবন দর্শন আমাকে মুগ্ধ করেছে, করেছে আকর্ষণ। ভারতবর্ষ আমাকে কাছে টানে। এই মহান পুণ্যভূমি ভারতবর্ষকে যে আমি কখনো স্পর্শ করতে পারবো একথা স্বপ্নেও ভাবিনি। সেই স্বপ্ন সফল হওয়ার প্রাক্ মুহূর্তে ভারতীয় জনগণকে জানাচ্ছি আমার হৃদয়ের আন্তরিক গভীর শ্রদ্ধা, প্রীতি—ভালোবাসা। ভারতভূমি আমাকে ধন্য করবে, আমি হবো পুণ্যবান।"

ভাষণ পর্ব শেষ করেই টোকিও থেকে বিমানে চড়ে বসলেন পেলে সহ কসমস দলের খেলোয়াড়েরা। সফরের দ্বিতীয় পর্যায়ে শুরু—চীন যাত্রা।

প্রসঙ্গ উল্লেখ্য, জাপানে মাত্র দুটি খেলা খেলেছে কসমস দল। একটি ১০ই সেপ্টেম্বর শক্তিশালী 'কুরু কাওয়া ডেনকোর' বিরুদ্ধে অন্যটি জাপান একাদশের বিরুদ্ধে। প্রথম ম্যাচে কসমস জিতেছে ৪-২ গোলে। এই ম্যাচে প্রথম গোলটি এসেছে পেলের বাড়ানো থ্রু পাস থেকে। মনোমুগ্ধকর এই থ্রু থেকে গোল করেছেন শিনাশালিয়া, অন্যটি করেন এ্যানিফ্লিও। দলের সর্বশেষ গোল করেছেন মহান পেলে ২৫ গজ দূর থেকে ডেডলিফট শটের সাহায্যে। সামনে দাঁড়ানো সাত সাতজন খেলোয়াড়ের প্রাচীর টপকে, কাউকে স্পর্শ না করে বলটি

সরাসরি ঢুকে যায় গোলে। পেলের এই গোল আবার প্রমাণ করে দিল সাঁইত্রিশ বছর বয়সেও আজও তিনি অনন্য—অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট। দ্বিতীয় খেলায় কসমস জিতেছিল ৩-১ গোলে। গোল করেছেন ক্লিনাক্লিয়া, টপিশ, মরেশ। এই ম্যাচে পেলের একটি ফ্রিক শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যায়। এই ম্যাচ দেখতে মাঠে উপস্থিত ছিলেন ৬৫ হাজার দর্শক।

জাপান পেরিয়ে চীন। কসমসের দ্বিতীয় সফর—পেলের শেষ জীবনের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। চীনে কসমস দুটি ম্যাচে অংশ নেয়। প্রথম খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় পিকিং'এর ওয়ার্কাস স্টেডিয়ামে। এই ম্যাচ দেখতে উপস্থিত ছিলেন কম পক্ষে আশি হাজার দর্শক। খেলার প্রথম অর্ধে কোন দলই গোল করতে পারে নি। দ্বিতীয়ার্ধের এগারো মিনিটের সময় প্রথম গোল আসে চীনা একাদশের হাফব্যাক লিউ সি ফু'র দুরন্ত শট থেকে। এরপরই খেলাটি জমে যায়। শেষ মুহূর্তে কসমস দলের হয়ে শেষ গোল শোধ করেন দলের বিকল্প খেলোয়াড় টনিফিল্ড। এইদিন কসমসের তুর্কি গোলরক্ষক এ্যারেল ইয়াসিনের দৃঢ়তার ফলে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা পায় কসমস। নিদেনপক্ষে দুটি অবধারিত গোল রক্ষা হয় ইয়াসিনের তৎপরতার জন্য। এই ম্যাচে কাইজার ফ্রনজ্ পেশীর ব্যথার জন্য অংশ গ্রহণ করেন নি। তবে পেলে ছিলেন। দলের এই গোলটির জন্য তার কৃতিত্ব ছিল ষোলোআনা।

এরপর সাংহাইয়ে বসলো চীন সফরের শেষ খেলা। এই দিন মাঠে প্রায় গত ম্যাচের মতোই দর্শক ছিল আশী হাজারের মতো। এই ম্যাচে চীনা দল রাখলো এক অসাধারণ ফুটবলের নজির। পেলে এই ম্যাচে প্রায় বন্দী অবস্থার মধ্যেই ছিলেন। প্রথমার্ধেই চীনা দল দু গোল দিয়ে এগিয়ে যায়। পরে দ্বিতীয়ার্ধের ২০ মিনিটের সময় ফ্রিকিক থেকে অবিশ্বাস্য কায়দায় গোল শোধ করেন ফুটবলের জাদুকর পেলে। এই ম্যাচেও বেকেনবাউয়ার মাঠে উপস্থিত ছিলেন না। এমন কি মাঝপথে আলবার্টো এবং রাইটব্যাক ববি স্মিথ পায়ের ব্যথার জন্য

মাঠের বাইরে চলে যান। খেলার শেষ মুহূর্তে কসমস দু-দুটি পেনালটি পায়—কিন্তু তারা এই সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগাতে না পারায় দলকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়।

চীন সফরে কসমসের এই পরাজয় শুধু যে বড় রকমের আলোড়ন তুলেছিল তাই নয়, সেই সঙ্গে একটি দুঃখজনক ঘটনাও ফুটবল অনুরাগীদের বিষণ্ণ করে তোলে। কসমস দলের লেফট আউট ১৮ই সেপ্টেম্বর রাত্রে হোটেলে ফেরার পথে হলেন ছুরিকাহত। যুগো-শ্লাভিয়ার মাদরাস্কো টপিক'এর সঙ্গে ছিলেন মার্কিন চিত্রাভিনেত্রী স্টেফানিক পাওয়ার। জনৈক চীনা আততায়ী টপিককে লক্ষ্য করে উদ্ধত ছুরি হাতে ধেয়ে আসে। টপিক আততায়ীকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা সত্ত্বেও আঘাতকে এড়াতে পারেন নি। ঘটনাটি ঘটে পিকিং এর সিটি সেন্টারের কাছাকাছি স্থানে। কসমস ক্লাবের কোচ এডি ফারমনি, চীনে কসমসের পরাজয় সম্পর্কে বলেছেন—চীন দল প্রথমার্ধে ভাল খেললেও দ্বিতীয়ার্ধে খেলার উপর তাদেরই প্রভাব ছিল। গোল দেবার মতো সুযোগ এসেছিল, কাজে লাগাতে না পারার জন্যই তাদের এই বিপর্যয়। বিশেষ করে দু-দুটো পেনালটি কিক নষ্ট হওয়ার জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। পরিশেষে এডি ফারমনি বলেছেন—এই ম্যাচে অনেক খেলোয়াড় আহত ছিলেন। দলের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে এগারোজনের একজনও সুস্থ ছিলেন না। পরাজয়ের এটিও একটি মস্ত কারণ।

চীন সফরের পালা চুকিয়ে এবার কসমসের লক্ষ্য—কলকাতা।

কলকাতা—স্বপ্ন নগরী কলকাতা।

২২শে সেপ্টম্বর—রাত ১১টা ৫ মিনিটে পেলে সহ কসমস দল এসে পৌঁছলো দমদম বিমান বন্দরে। রাতের কলকাতায় সেদিন ছিল দিনের সাজ। বাঁধনহারা উদ্বেলিত মানুষ স্বাগত জানাতে এসেছিলেন ফুটবলের রাজা পেলেকে। পেলে তোমায় দেখবো—কেবল চোখের দেখা। আরবী ঘোড়ার মতো টগবগিয়ে এয়ার

ইণ্ডিয়ার জেট বিমান বন্দর স্পর্শ করামাত্র চিৎকার করে উঠলেন উদ্বেলিত মানুষ। সে এক দৃশ্য—অবর্ণনীয়। বিমান বন্দরে পা দিয়েই ফুটবলের কিংবদন্তীর নায়ক বললেন—আমি অভিভূত। এমন সম্মান এর আগে কোথাও পাই নি। কলকাতাকে আমি মনে রাখবো। এর পর দমদম থেকে বিশেষ দামী লাকসারি বাসে চাপিয়ে ফুটবলের রাজাকে নিয়ে আসা হলো গ্র্যাণ্ড হোটেলের ৩১৭ নম্বরের সুসজ্জিত ঘরে।

কলকাতার স্বপ্ন এতদিনে সার্থক। কখনও যে আমরা এমন এক কিংবদন্তীর মানুষকে চোখের দেখাও দেখতে পাব সে কথা ভাবিনি। তাই স্বপ্ন চরিতার্থের মোহময় উচ্ছ্বাসের গরিমায় কলকাতা যেন পেলের প্রেমে হয়ে উঠেছিল মাতোয়ারা। ট্রামে, বাসে, অফিস-আদালতে সর্বত্রই পেলে আর পেলে। পেলে প্রেমে কলকাতা বিভোর। ভক্তের প্রেমাসিক্ত ভক্তির নাগপাশে বদ্ধ হতেই তো ভালোবাসেন প্রেমের ভগবান—তাই তো ভক্ত ভগবানের মিলন এমন মধুর হয়। কলকাতায় পেলে,—পেলে পদার্পণে কলকাতা বিমুগ্ধ। সম্রাট সহধর্মিণী রোজি মেরী কলকাতার পাগলপারা উচ্ছ্বাসে অবিভূত হয়ে বললেন—"আমরা যেন দুরন্ত ভালোবাসার দুর্গে বন্দী হয়ে বসে আছি।" আর সম্রাট—তিনি কি বিব্রত? না—বরং উচ্ছ্বসিত মানুষের হৃদয় উদ্বেলিত অভিবাদনকে দুহাতে গ্রহণ করে বললেন—"যা চেয়েছি সব পেয়েছি—আমি ভাগ্যবান। ভারতবর্ষকে দেখার ইচ্ছে ছিল, আজ আমার সেই আশা পূরণ হয়েছে, আমি ধন্য।"

কলকাতায় পেলে খেলবেন, না তো সাধন ক্ষেত্রে ঈশ্বর দেখা দেবেন—কলকাতার মানুষ ভারতীয় ফুটবল অনুরাগীরা কালো মেঘের মতো ছেঁকে এসেছিলেন সেদিন ইডেনে। বর্ষণসিক্ত ইডেনে হয়তো সম্রাটের খেলা দেখা যাবে না এই ধারণাই ছিল অনেকের। তবু তৃষিত ভক্তের আকুতিকে শেষ অবধি উপেক্ষা করতে পারলেন না ফুটবলের রাজা—বর্ষণসিক্ত ইডেন তার স্বাভাবিক

খেলার অনুপোযোগী হওয়া সত্ত্বেও তিনি শুভ্রবর্ণে মাঠে আবিভূ্ত হলেন ভারতীয় দর্শকদের তৃষ্ণা দূর করতে।

২৪শে সেপ্টেম্বর ! কলকাতার মানুষের কাছে এক স্মরণীয় মুহূর্ত। কলকাতার নন্দনকানন ইডেনে পা ছোঁয়ালেন ফুটবলের অপ্রতিদ্বন্দ্বী এক অনন্য সম্রাট। ইডেন যেন উপচে পড়েছিল মানুষের ভিড়ে। মানুষ আর মানুষ—চারদিকে শুধু কালো মাথা। সবাইয়ের দৃষ্টি একদিকে—দশনম্বর জার্সি—রাজ দর্শনে।

খেলা শুরুর আগে কলকাতার মানুষ উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে, প্রত্যাশাকে তুলে রেখেছিল কাঞ্চনজঙ্ঘার উচ্চ শৃঙ্গে। তারা বয়সে ভারাক্রান্ত রাজার মধ্যে দেখতে চেয়েছিলেন যৌবনের সেই অপ্রতিরোধ্য দ্যুতি—কিন্তু তাকি সম্ভব। কল্পনার অতিরঞ্জিত রঙ, তুলি বাস্তবতাকে অধিকার করবে কি করে—তাই কলকাতার প্রত্যাশা পরিপূর্ণ হলো না। রাজা যেন এইদিন ভালোবাসার বাগবন্দী খেলায় নিজেকে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। তার খেলার মধ্যে দেখা গেল না তার স্বকীয় চাতুরী মাখানো দ্যুতি—বরং সেই তুলনায় দর্শকদের মন কেড়ে নিয়েছিলেন স্থানীয় খেলোয়াড়েরা। সত্যি বলতে কি, এই দিন মোহনবাগানের খেলার মধ্যে ছিল বিশ্ব ফুটবল পর্যায়ের উচ্চ গুণাগুণ। বিশেষ করে হাবিব, বিদেশ বসু যেভাবে বল নিয়ে কসমস সীমানার দিকে ধেয়ে গিয়েছেন, তা দেখে কলকাতার মানুষ হয়েছেন স্তম্ভিত। রক্ষণভাগের খেলোয়াড়েরা পেলেকে কড়া পাহারায় নজরবন্দী করে রেখেছিলেন বলবো। এই কঠিন দুর্ভেদ্য প্রাচীর ডিঙিয়ে বর্ষণসিক্ত মাঠে ফুটবলের রাজা পারেন নি নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবে প্রতিভাত করতে। মহামান্য পেলেকে স্বাভাবিক ক্রীড়ানৈপুণ্যে প্রকাশিত হতে না দেখায় কলকাতার মানুষ হয়ত বা খুশী হতে পারেন নি। আগেই বলছি প্রত্যাশা ছিল অনেক উচ্চে—অত উচ্চে দাঁড়িয়ে কি সূক্ষ্মতর বিচার করা চলে। তাই সম্রাটের সূক্ষ্ম চাতুর্য ঠিক ভাবেই অনেকে ঠাওর করতে পারেন নি। যারা সত্যিকার ফুটবলের বুঝদার তারা অবশ্যই মহান এই মানুষটির সব

রকম অসুবিধের কথা চিন্তা করেই যা সেদিন প্রত্যক্ষ করেছেন, তাতেই তাদের মন ভরে উঠেছে। বিশেষ করে তার ডিস্ট্রিবিউশান, পাসিং এবং সুটিং ছিল দেখার মতো। বলকে তিনি নিজের কাছে বড় একটা পাওয়ার চেষ্টা না করেই খেলেছেন। তবু তার মধ্যেও যে কটি বল তার কাছে এসেছিল, তাকে তিনি সুন্দর ভাবে বাড়িয়ে দিয়েছেন সতীর্থের দিকে। খেলা শুরুর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই চকিতে পেনালটি বক্সের মাথার উপর থেকে একটি শট নিয়েছিলেন পেলে—অল্পের জন্য তা লক্ষভ্রষ্ট হয়ে যায়। বর্ষণসিক্ত ইডেনে তার যে ছুটতে অসুবিধা হচ্ছিল তা মাঠে নামার সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা গিয়েছে। এরপর মহান পেলের চমৎকার ভাবে বাড়িয়ে দেওয়া একটি পাস থেকে সহজ ভাবে গোল করেন আলবার্টো। কসমসের এই অগ্রগতি বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়নি। দুমিনিটের মধ্যেই মোহনবাগানের শ্যাম থাপা, আলবার্টোর ভুলে ফসকানো বলে ছুটে গিয়ে গোল করেন। এর আগেই বিদেশ'এর সেন্টার থেকে শ্যাম একটা গোল করার সুবর্ণ সুযোগ পান, কিন্তু তিনি তা কোন কাজে লাগাতে পারেন নি। মিনিট চব্বিশের মাথায় মোহনবাগানের গোলের মধ্যে একটি অবধারিত সুযোগ পেলেন পেলে। সামনে কেবল মাত্র গোল-পোস্ট রক্ষিত অসহায় সেনা শিবাজী। মরিয়া শিবাজী বুকে ভরসা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তার পায়ের ওপর। ওই বল অব্যর্থ গোল—এমন সুযোগ কোন ফুটবলার অপচয় করতে হয়ত চাইতেন না। কিন্তু পেলে তিনি ফুটবলারের ফুটবলার আদর্শের আদর্শ—মহামানব। তাই চকিতে বল লক্ষ্য উঁচানো পাকে ওই অবস্থায় যান্ত্রিক কৌশলে থামিয়ে দিলেন যেন—তারপর পাখির মতো এক পায়ের ওপর ভর দিয়ে টপকে গেলেন গোল রক্ষক শিবাজীকে। একথা অস্বীকার করার কারণ নেই সেই মুহূর্তে যদি তিনি খেলায় মোহময় গরিমাকে আঁকড়ে ধরতে গিয়ে উঁচানো পাটিকে বলের ওপর একবার স্পর্শ করতেন—তাহলে গোল তো হতোই—হয়ত বা শিবাজীও জড়িয়ে পড়তো জালে।

এই ঘটনার খানিক বাদে মোহনবাগানের পক্ষে হাবিব দিলেন

আর একটি গোল। এই গোলের জন্য গোলরক্ষক ইয়াসিনই দায়ী। পেনালটি বক্সের বাইরে থেকে আকবরের শট তার হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলে, হাবিব তা গোলে ঠেলে দেন। দ্বিতীয়ার্ধে কসমস এই গোল শোধ করে পেনালটিতে। শেষ পর্যন্ত দু দলই তুমুল যুদ্ধ চালালেও খেলার ফলাফলের কোন মীমাংসা হলো না। ২-২ গোলে ম্যাচ হলো অমীমাংসিত।

এখন প্রশ্ন আমরা পেলের কাছে কি পেলাম? আগেই বলেছি আশা আমাদের আকাশচুম্বী ছিল, তাই সেই প্রত্যাশা মেটেনি। বরং সাধারণ দৃষ্টিতে তাকে মাঠের মধ্যে রেফারির মতো ছুটে বেড়া-তেই দেখা গেছে। কিন্তু তা ঠিক নয়। ওই না খেলার মধ্যেও তার অভিজ্ঞতা যে ভাবে কাজ করেছে তা ছিল দেখার মতো। সব কিছু কি আর বাইরে থেকে স্থূল চোখে দেখা যায় না বোঝা যায়। তাই যারা অন্তর্দৃষ্টিকে খুলে রেখে রাজদর্শনের প্রত্যাশী হয়েছিলেন, তারাই বুঝেছেন তার ক্রীড়ানৈপুণ্যের সত্যিকার দ্যুতি। বিশেষ করে তার চকিতে শট নেওয়ার কৌশল, বলকে দ্রুত ঠিক জায়গায় ঠিক ভাবে বাড়িয়ে দেবার পদ্ধতি ছিল দেখার মতো। তার অঙ্গুলি নির্দেশেই যে কসমস আক্রমণ পরিচালিত, সেটা বুঝতে আমাদের কোন অসুবিধে হয় নি। বিশেষ করে তার একটি সরাসরি ফ্রিকিক যে ভাবে বাতাসে বাঁক নিয়ে গোলাভিমুখে প্রবেশ করেছিল, তা দেখে বলতে বাধা নেই —এমন ইনসুইং করতে হাতের টানে ডেভিডসনকেও দেখা যায় নি। তাছাড়া একটি ব্যাক স্পিন-ফ্লিক তিনি যেভাবে টনি ফিল্ডের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন—তা থেকে আর খানিকটা তৎপর হতে পারলে হয়তো গোল হতে পারতো।

পরিশেষে বলি—এই খেলা যাই হোক না কেন, এ ছিল রাজ-বিগ্রহে প্রাণ প্রতিষ্ঠার মাহেন্দ্রক্ষণ। পেলে—যিনি একদিন স্বপ্নের মানুষ হয়ে আমাদের আলালী আকাঙ্ক্ষার গভীর কন্দরে—কেবল স্নেহময় এক বিগ্রহ হিসাবে স্থাপিত ছিলেন—সেই তাকেই আমরা প্রত্যক্ষ করেছি—দেখেছি দেববিগ্রহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হতে—একি কম সৌভা-

গ্যের কথা। রাজদর্শন—রাজদর্শনই। এখানে থাকে না কোন যুক্তি, কোন দ্বন্দ্ব, কোন তর্ক, তাই বলি এই স্মৃতি আমাদের অমর করে রাখবে—এই স্মৃতিই বলবে বিদেশের মাটিতে পেলের শেষ খেলা কলকাতায়—কলকাতার ইডেনে।

কলকাতায় পেলে খেলতে পারেন নি, তার একটি মাত্র কারণ হলো ইডেনের নরম মাটির আঠালো ভালোবাসা। ইডেনকে যারা চেনেন, যারা জানেন, এই মাঠ ক্রিকেটকে যে ভাবে ভালোবাসে ঠিক সেই ভাবে ফুটবলকে সে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে পারে না। ইডেনের বুকে যেন জোর করে তুলে দেওয়া হয়েছে ফুটবলকে। ইডেন শাস্ত্রিয় বিধি নিয়োগে আবদ্ধ হলেও, হৃদয় স্বতঃস্ফূর্ত তাগিদে মিলতে পারে নি কোনদিন। তাই ইডেনের বুকে ক্রিকেটকে যে ভাবে মানায় ফুটবলকে সে ভাবে মানায় না। বেমানান মাঠে ফুটবলের রাজা তাই পারলেন না তার নিজস্ব কারুকুরিতে কলকাতার মানুষকে বিমুগ্ধ করতে। যদিও তিনি খেলা শেষে খেলোয়াড়চিত পরিচয় দিয়ে বলেছেন—"কলকাতার ফুটবলারেরা আমাকে অবাক করে দিয়েছে। আমি ভাবতে পারিনি ভারতে এসে এমন খেলা দেখতে পাব। মাঠের দোষে আমি যে স্বাভাবিক খেলা খেলতে পারি নি, তা নয়। এখানকার ভিজে ভারি মাঠে খেলতে অসুবিধে কিছুটা হয়েছে সত্যি, তাবলে সব দোষটুকু মাঠের ওপর চাপানো ঠিক নয়। প্রতিপক্ষ আমাদের খেলতে দেয় নি। ওদের খেলা আমাকে মুগ্ধ করেছে।" বিশেষ করে তিনি হাবিব ও বিদেশের যৌথ আক্রমণ পদ্ধতিকে তারিফ করে বলেছেন—"ওদের কমবিনেশান আমাকে ব্রেজিলের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। প্রথমার্ধে যা খেলা হয়েছে তাতে মোহনবাগানের ২-১ এর বদলে ৪-১ গোলে এগিয়ে থাকা উচিত ছিল।" পরিশেষে তিনি কলকাতার মানুষের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দনে বিমূঢ় অনুভূতিতে আবির্ভূত হয়ে বললেন—"এত উচ্ছ্বাস—সত্যি কলকাতা ফুটবলের শহর। আমার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা কলকাতার মানুষকে—এরা আমার স্মৃতির শেষ অধ্যায়কে মহান্বিত করেছে। কলকাতা এবং কলকাতার মানুষের

আন্তরিকতা আমি কোনদিনই ভুলতে পারবো না। আবার আসার ইচ্ছে থাকলো। যদি কোনদিন সম্ভব হয় আমি আবার আসবো—আসবো কলকাতাকে দেখতে। তাদের আন্তরিক ভালোবাসায় ভুলে থাকতে

কলকাতায় পেলে একজন ফুটবলার হিসাবে সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তরের জবাব দিতে গিয়ে বলেছেন—"ফুটবল নির্ভর করে ফুটবলারের নিজস্ব গুণগত বৈশিষ্ট্যের ওপর। এই বৈশিষ্ট্যের মূল উপাদান হলো ফুটবলের প্রতি ভালোবাসা এবং আত্মত্যাগ। ফুটবলের জন্য আত্মত্যাগ না করলে কখনোই বড় ফুটবলার হওয়া যায় না। সংযম, অনুশীলন, অধ্যবসায় হলো ফুটবলার গড়ার মস্ত গুণ। এই গুণের মধ্যে গড়ে ওঠে চারিত্রিক কাঠামো। একজন ফুটবলারকে অতি অবশ্যই একজন সত্যিকার চরিত্র সম্পন্ন মানুষ হতে হবে। শুধু ফুটবলার কেন, যে কোন স্তরে যে কোন শিল্পে বড় হতে গেলে সবার আগে দরকার হলো নিজেকে একজন সত্যিকার মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা। চরিত্র যদি ঠিক না হয়, তাহলে তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস, আত্মপ্রত্যয়, আত্ম-সচেতনবোধ কিভাবে তৈরি হবে! আমি তাই বলি ফুটবল শেখার আগে, জানার আগে, দরকার হলো নিজেকে জানা এবং চেনা। যে পারে—সেই বড় হয়, বড় হওয়া তার পক্ষে সহজ হয়ে দাঁড়ায়। আর একটা কথা মনে রাখা দরকার—ধূমপান এবং মাদকদ্রব্য সেবন ফুটবলের পক্ষে ক্ষতিকর। এই দুই নেশা থেকে নিজেকে বিরত রাখাই হলো ফুটবলারের প্রাথমিক কর্তব্য।

আমি পেলে—পেলে হয়েছি কেবলমাত্র ঈশ্বরের অপার করুণায়। তিনি আমাকে সময় মতো শক্তি যুগিয়ে দেন, বুদ্ধি দেন, বিবেচনা দেন। আমি তাঁর নির্দেশমতো খেলি। তাই বলতে দ্বিধা নেই আমার সাফল্যের চাবিকাঠিটি ঈশ্বরের হাতে। আমার দায়িত্ব অনুশীলন ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে নিজেকে গড়ে নেওয়া। আমি তাই করেছি, এর বেশী আর আমার কিছু বলার নেই। আমি বিশ্বাস করি না, ইচ্ছে

করলে সবাই বড় হতে পারে। ইচ্ছা ও উদ্যোগের সঙ্গে থাকা চাই ঈশ্বরের কৃপা। সেই কৃপা আমি পেয়েছি, আমি ধন্য—আর তারি জন্য যা চেয়েছি, তাই আমি পেয়েছি।

এর পর তাকে প্রশ্ন করা হলো—লোকে যখন আপনাকে কিং বলে, তখন আপনার তা শুনতে কেমন লাগে?

উত্তরে পেলে বললেন—ভাল, কার না ভালো লাগে বলুন। আমিও তো মানুষ দেবতা নই। তবে নিজের মুখে আমি নিজেকে শ্রেষ্ঠ একথা কখনই বলিনি আর বলবোও না—কারণ এটা বলা অপরাধ, এবং বোকামো।

হ্যাঁ আর একটা কথা—তা হলো ভালোবাসা। ফুটবলকে ভালো-বাসার মতো ভালোবাসতে হবে। ফুটবলার তা সে যে ধর্মের মানুষই হোক না কেন। ধর্ম নিয়ে ভালোবাসা বদল হয় না। ধর্ম তো আবরণ —আসল কথা হলো মানুষের হৃদয়—এই হৃদয়কে ভালোবাসায় জয় করতে হবে। আমি নিজে কৃষ্ণবর্ণের মানুষ—অথচ আমার এই কালো রঙের জন্য আমাকে দুনিয়ার মানুষ যখন ঘৃণা করেনি—তারা সবাই আমায় ভালোবাসে আর আমিও।

পরিশেষে সাম্প্রতিক এশিয়া সফরের বিশ্লেষণ করে মহান ফুটবলার বললেন—"চীন দল দারুণ ফুটবল খেলেছে। বিশেষ করে চীনরা প্রথমার্ধে যা খেলেছে তাতে আমরা দাঁড়াতে পারিনি। তবে দ্বিতীয়ার্ধে আমরা নৈপুণ্য দেখিয়েছি—তাতে আমাদের জেতা উচিত ছিল। চীনে ভালো ফুটবলার আছেন, আছে তাদের টিম স্পিড। ওদের এখন দরকার হলো বিশ্ব ফুটবলের অভিজ্ঞতা।"

ফুটবলের বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ সম্রাট পেলে, যার আগমনে এত সমারোহ, এত উদ্দীপনা,—সেই তিনি বড় বিষাদের মধ্যে বিদায় নিলেন। কলকাতা তাকে সমারোহের ঘনঘটায় আবাহন করলেও, বিদায় মুহূর্তে শেষ রক্ষা করতে পারেনি। বিদায় বেলায় রাজা চলে গেলেন উচ্ছ্বাসহীন অবিভাবদনের মধ্যে দিয়ে, সাধারণ একজন নাগরিক

হিসাবে। কেন—কেন এই বিষণ্ণ বিদায়? এর উত্তরে বলা যায়, কলকাতার অভিমান। কলকাতা তার কাছে আশা করেছিল অনেক কিছু, কিন্তু সে আশা তিনি পূরণ করতে পারেন নি। প্রত্যাশা অপূর্ণের জন্যই রাজার প্রতি ফুটবল নগরী কলকাতার এই অভিমান। কিন্তু এটা ঠিক নয়—আমরা আমাদের প্রত্যাশাকে বড় উচ্চে আসীন রেখেছিলাম, যে উচ্চশিখরে আজ আর প্রতিকূল মাঠে নিজস্ব বিচ্ছুরণে আলোকিত হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। ১৯৭৭ সালের সঙ্গে ১৯৫৮ সালের অনেক তফাৎ। সেদিন রাজা ছিলেন যৌবনের উন্মাদনায় অভিষিক্ত, আজ সেই তিনি প্রৌঢ়ত্বের টানে অনেক শ্লথ। তবু তার মধ্যে যে অভিজ্ঞতা—তাকি দেখার মতো ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল—অবাক হয়ে মানুষ ইডেনের পিচ্ছিল কাদা মাঠে দেখেছেন, কেমন করে চকিতে তিনি নিজের পা থেকে বলকে পিনকোড নাম্বার লিখে পাঠিয়ে দিয়েছেন কখনও ক্লিনাকিয়া, কখন বা আলবার্তো বা টনি ফ্লিণ্ডের কাছে। এই সঙ্গে তার বিখ্যাত ফ্লিকিক শট—যা অবিশ্বাস্য, অভাবনীয়। এর বেশী আর কি তিনি দেবেন—আর কি বেশী আশা করবো আমরা তার কাছ থেকে। এর পর আরো কিছু চাওয়া, আমাদের অতিরিক্ত দুরাশা হয়ে দাঁড়ায় নাকি? তাই আমাদের দুরাশা—দুরাশাই থেকে গেছে। কিন্তু যারা ফুটবলের সত্যিকার সমজদার, বোদ্ধা, কুশলী তারা কিন্তু ওরই মধ্যে চিনে নিয়েছেন পেলেকে—পেলে মাহাত্ম্যকে, এইখানেই বুঝি বুদ্ধির সঙ্গে আবেগের মস্ত তফাৎ। তাই ইডেনে খেলার পর আবেগধর্মী কতিপয় সাংবাদিক আক্ষেপ করে লিখলেন—"প্রত্যাশা অপূর্ণ রইল।" কেউ বা বললেন —"পেলেকে দেখলাম না।" আবার কারো ভাষায়—"পেলে—পরাজিত সম্রাট।"

সত্যি কি তাই—সত্যি কি তিনি পরাজিত? যদি পরাজিত হবেন, তাহলে সেই রাজা জাপানের মাঠে ওমন দুর্ধর্ষ লড়াই করলেন কি করে? কি করে ভেদ করলেন চীনের দুর্ভেদ্য প্রাচীর? কলকাতার ইডেন যে পেলেকে খেলতে দিল না,—একথা কি ঠিক নয়। ক্রিকেট

প্রেমিক ইডেন যে ফুটবলকে চায় না—এটা তার আর একটি জ্বলন্ত নজির নয় কি ?

এই কলকাতার যারা ফুটবলার, যারা কলমবীরদের মতো কেবল চোখ দিয়ে ফুটবল খেলেন না, যাদের আছে ব্যক্তি অভিজ্ঞতা—তারা কি বলেছেন এই খেলা সম্পর্কে ? তারা কি সাধারণ দর্শক এবং চোখ-সর্বস্ব কলমবাজদের মতো অপ্রসন্ন হয়েছিলেন ?

না—তা হন নি। রাজাকে তারা রাজা বলেই স্বীকার করেছেন। বিচার করেছেন একজন ফুটবলারকে সত্যিকার প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে। ভারতীয় খেলোয়াড়েরা খেলা শেষে সমবেত কণ্ঠস্বরে বলেছেন—"আমরা কিন্তু কেউই অবাক হইনি। স্বাভাবিক রীতিতে যা ঘটার তাই ঘটেছে। প্রথমশ্রেণীর ফুটবল থেকে পেলে সরে গেছেন উনিশশো চুয়াত্তর সালে। আর আজ উনিশশো সাতাত্তর—বয়স হয়েছে ওর। বয়সের ভারে বিশ্বসংসারে অবক্ষয় ঘটে। দেহ অপটু হয়। পেলে একজন মানুষ, তিনি এর ব্যতিক্রম নন। তবু পেলে—পেলেই। সূর্যাস্তের পরও কি সূর্যকে অস্বীকার করা যায় ?

ভারতের প্রাক্তন ওলিম্পিক অধিনায়ক বদ্রু ব্যানার্জী বলেছেন—'ফুটবলের রূপকথার রাজকুমারকে দেখে আমাদের মন ভরলো না—সে দুর্ভাগ্য আমাদের। আমার মতে চার-চারটি বিশ্বকাপের অসামান্য ভূমিকায় প্রতিভাত পেলে এখন স্তিমিত। এখন তার কাছে তারুণ্যের আচরণ আশা করা বাতুলতা। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সামর্থ্যের একটা সীমানা আছে। অতীত কখনই বর্তমানের মধ্যে ধরা দেয় না। তবু তার মধ্যেও দু-একটি সূক্ষ্ম পায়ের কাজ যা দেখেছি তা আমাদের সৌভাগ্যই বলবো। ঠিক জায়গায়, ঠিক ভাবে, ঠিক সময় সহজাত তাৎক্ষণিক বিচার বোধে বলকে পাঠানোর কৌশলে—পেলে এখনও পেলেই। মাঠ শুকনো থাকলে হয়ত তাকে আর একটু উজ্জ্বল দেখতে পেতাম।"

বলরামের ভাষায়—"পেলে সমালোচনার উর্ধ্বে। যারা ফুটবলকে একটু আধটু বোঝেন তাদের পক্ষে পেলের অসুবিধাগুলো বুঝতে

দেরী হওয়া উচিত নয়। শরীর প্রাণ অপটু। কিন্তু চিন্তা, যা তাৎক্ষণিক উপলব্ধির শক্তি, তা এখনও তীক্ষ্ণই। পেলের যে রূপটিই আমরা দেখে থাকি না কেন, আজ আমার জীবন ধন্য হলো। সার্থক হলো।"

আর রোম ওলিম্পিকে ভারতীয় দলের ব্যাক ও বর্তমান ভারতীয় কোচ অরুণ ঘোষ বললেন—"ঈশ্বর দত্ত ক্ষমতার অধিকারী পেলে কিন্তু ঈশ্বর নন। সব কিছুরই একটা সীমা আছে। বয়সকে আমাদের অস্বীকার করলে চলবে না। তাই সব কিছু ভেবে নিয়েই আমি মাঠে গিয়েছিলাম, তাই হতাশ হইনি। আর পেলে যখন পেলে ছিলেন তখন তার পাশে কে ছিলো সেটাও একবার দেখতে হবে তো? সেদিন পেলের পাশে ছিলেন ডি. ডি. ভাভা, গারিঞ্চা, জাগালো, জিটো জালমা, আর আজ······!"

আর বর্তমানের সেরা ভারতীয় উইংগার সুরজিৎ সেনগুপ্ত—তিনি আরো স্পষ্ট ভাষায় অকপটে স্বীকার করছেন—"পেলেকে দেখলাম। কতকালের একটা স্বপ্ন সার্থক হলো। তিনি সমস্ত সমালোচনার ঊর্ধ্বে। তাকে যে দুচোখ ভরে দেখলাম—এও তো কম কথা নয়।"

পরিশেষে বলি—রাজা রাজাই। কলকাতা সার্থক। রাজদর্শনে পরিপূর্ণ তার হৃদয়। স্বপ্নের রাজা বাস্তব চোখে ধরা দিয়েছেন দুচোখের তারায়—একি আমাদের কম পাওয়া নয়?

পেলে ও বেকেনবাউয়ার

কসমস ক্লাবের বহুদিনের ইচ্ছে পূরণ করলেন পশ্চিম জার্মানীর সেই বিখ্যাত চোখ জুড়ানো ফুটবলার ফ্রনজ বেকেনবাউয়ার।

বেকেনবাউয়ারকে দলে টানার জন্য কসমস ক্লাব কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করেছিলেন বহুদিন। যে কোন কারণেই হোক তারা পেলের মতো মূল্যবান মানিক ঘরে তুললেও, সেদিন পারেননি বেকেনবাউয়ারকে সংগ্রহ করতে।

সেদিন বেকেনবাউয়ারকে দলে না আনতে পারার কারণ ছিল বেকেনবাউয়ারের সঙ্গে বেয়ার্ন মিউনিখ ক্লাবের লিখিত চুক্তিপত্রটি। এই চুক্তিতে দেখা যায়, বেকেনবাউয়ার বেয়ার্ন মিউনিখ দলের সঙ্গে ১৯৭৯ সালের জুনমাস পর্যন্ত সাড়ে সাত লাখ টাকায় সই করে বসে আছেন। ফলে সেদিন কসমস ক্লাব এজেন্ট হিসাবে বেয়ার্ন মিউনিখের ম্যানেজার রবার্ট শ্বোয়ান তার কাজে সফল হতে পারেন নি। বরং তাকে দল থেকে নির্বাসিত হতে হয়েছে।

ব্যাপারটা ফাঁস হওয়ার পর কসমস ক্লাবের কর্তার দল বুঝতে পারলেন, বেকেনবাউয়ারকে তাদের দলেপাওয়া সম্ভব নয়। আর এমন একটা মুখরোচক খবর জার্মানীতেও চাপা থাকলো না। বিশেষ করে "বেকেনবাউয়ার ষড়যন্ত্র" ঘটনাকে ফলাও করে বাহবা কুড়াবার জন্য দেশবাসীকে বলে বেড়াতে লাগলেন বেয়ার্ন দলের প্রেসিডেন্ট উইলহেলম্ নিউডেকার। এর ফলে পশ্চিম জার্মানী ঘিরে উঠলো তুমুল তর্কবির্তকের ঝড়। অনেকেই ব্যাপারটার জন্য দোষী সাব্যস্ত করলেন স্বয়ং বেকনবাউয়ারকে। ফলে জনপ্রিয় বেকনবাউয়ারের জনপ্রিয়তা খানিকটা খাটো হয়ে গেলো। হয়ত এতেও মত পরিবর্তন করতেন না মানুষটা—ব্যাপারটা চরমে উঠলো হামবুর্গে পূর্ব জার্মানীর কাছে বেয়ার্ন মিউনিখের দলের ৫-০ গোলে শোচনীয় পরাজয়কে কেন্দ্র করে। এই পরাজয়ের জন্য পশ্চিম জার্মানীর মানুষ সর্বাগ্রে দায়ী করলেন তাকে। বিদ্রূপ, ঠাট্টায় পশ্চিম জার্মানীর বাতাস এমন উত্তপ্ত হয়ে উঠলো যে বেকেনবাউয়ারের পক্ষে আর ধৈর্য ধরে রাখা সম্ভব হলো না।

প্রতিদিন তাকে উদ্দেশ্য করে স্বদেশবাসীরা বিদ্রূপে শিস দিতে লাগলেন। মাঠে তিনি খেলতে নামলেই, শোনা যেতে লাগলো অশ্রাব্য গালিগালাজ। ব্যাপারটা শেষে এমনই চরমে উঠলো যে তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও সংবাদপত্রের পাতায় শুরু হলো রসালো লেখালিখির পালা ? বিশেষত তার বিরুদ্ধে আনা হলো ইনকামট্যাক্স ফাঁকির অভিযোগ।

ভাবলে অবাক লাগে—একদিন এই বেকেনবাউয়ারকে ঘিরেই

পশ্চিম জার্মানীর মানুষ গর্বে বুক চিতিয়ে বলেছিল ; "আমরা গর্বিত, এমন একজন ফুটবলার আমাদের দেশে জন্মেছেন।"

১৯৫৬ সাল থেকে মানুষটা পশ্চিম জার্মানীর হয়ে একশোটির উপর খেলেছেন আন্তর্জাতিক খেলা। চার চার বার তিনিই ছিলেন বিশ্বকাপ ফাইনাল পর্যায়ের খেলায় আউটস্ট্যাণ্ডিং সুইপার।

১৯৬৬ সালে—ওয়েম্বলী স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলার পর ইংল্যাণ্ডের রানীর হাত থেকে রার্নাস পদক গ্রহণ করার জন্য এগিয়ে গেলেন বেকনবাউয়ার, তখন সারামাঠ জুড়ে ধ্বনিত হচ্ছিল বিপুল করতালি, মুখরিত সেই করতালি ধ্বনি ভেদ করে বাতাস কাঁপিয়ে শোনা যাচ্ছিল কয়টি মাত্র কথা—"আউটস্ট্যাণ্ডিং হাফ ব্যাক অফ দ্যা টুর্নামেন্ট।

জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে বেকনবাউয়ার পেলের তুলনায় খুব একটা খাটো ছিলেন না। পেলে যেমন ব্রেজিলের ঈশ্বর, বেকনবাউয়ার তেমনি পশ্চিম জার্মানীর। ১৯৭০ সালে মেক্সিকোতে বিশ্বকাপ খেলার পর ঠিক হয় রাজধানীতে একটি রাস্তার নাম করা হবে "ওয়ার্লড সকার অ্যাভিনু"—আর এই রাস্তায় মাঝে মাঝে স্থাপিত হবে বিশ্ব-ফুটবল তারকাদের আবক্ষ মূর্তি এবং তা হবে বিশ্বফুটবলে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কম ঝড় বয়ে যায় নি মেক্সিকোর ওপর। সকলের মনেই প্রশ্ন ছিল—কার মূর্তি আগে বসানো হবে ?—সে কি পেলে, নাকি অন্য কেউ ?

উপরোক্ত আলোচনা থেকে পাঠকগণ নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছেন বেকেনবাউয়ারের সত্যিকার ফুটবল গরিমা। সাধে কি সেদিন তার সমর্থনে দাবী জোরদার হয়েছিল "ওয়ালর্ড সকার অ্যাভিনু"তে যোগ্যতা বিচারে মূর্তি স্থাপনের ব্যাপারে।

একথা ঠিক ফুটবলের জাতবিচারে পেলেই শ্রেষ্ঠ, তবু কয়েকটি শিল্প সংস্থা গুণের নিরিখে চতুর্থ স্থান অধিকারী বেকেনবাউয়ার-এর ক্রীড়া-শৈলীর মাধুর্যে পেলের পরই তার মূর্তি স্থাপনের দাবী করেছিলেন।

সেই বেকেনবাউয়ার—যার স্থান ক্রীড়াশৈলীর মাধুর্যে পেলের পরেই বলে অনেকের দাবীতে সমর্থিত, সেই তিনি আজ কসমস দলে অগ্রজ পেলের একমাত্র সঙ্গী।

পেলে আর বেকেনবাউয়ার, এ যেন একই বৃন্তে ছুটি ফুল।

বেকেনবাউয়ারের মতো খেলোয়াড় কেন কসমসে এলেন—এ প্রশ্ন আজ অনেকের। একদিন যেমন পেলেকে ঘিরেও এই একই প্রশ্ন করেছিলেন অনেকে, ঠিক তেমনি আজ সেই প্রশ্ন।

মানুষটা তো জীবনে পেয়েছেন অনেক কিছু—অনেক সম্মান, অনেক অর্থ, আর কি তার পাওয়ার ছিল। কিশোর বয়সে বিশ্ব বিজয়ী যুব দলের করেছেন যেমন অধিনায়কত্ব, ঠিক তেমনি যৌবনে করেছেন জার্মানীর প্রতিনিধিত্ব—পেয়েছেন বিশ্বকাপ। এমন সম্মান আর কজন পায়, পেতে পারে। এ সম্মান তো মহান ফুটবলার পেলের ভাগ্যেও আসেনি।

তবু সেদিন যেমন পেলের বিষয়ে যথার্থ কোন উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় নি, তেমনি আজও পাওয়া যায় নি বেকেনবাউয়ারের ক্ষেত্রে যথার্থ কোন উত্তর। শুধু জানা গেছে কসমস ক্লাবে বেকেনবাউয়ারের ক্রয় মূল্যের পরিমাণ সাত মিলিয়ান মার্কস যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ছু কোটি সত্তর লক্ষ টাকা।

পেলের চোখে বিশ্ব বাছাই

আমি পেলে, তোমাদের পেলে। আমাকে তোমরা বলেছ ফুটবলের সেরা খেলোয়াড়দের নির্বাচন করতে। কাজটা খুব সহজ নয়। কারণ নির্বাচন ক্ষেত্রে নির্বাচকের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ এবং নিজস্ব একটা ধারার প্রতি ছুর্বলতার প্রভাব কিছু না কিছু থেকেই যায়—আমিও হয়ত তার ব্যতিক্রম নই। আমি দীর্ঘ বাইশ বছর ফুটবল খেলেছি। এই দীর্ঘ সময়ে আমি দেখেছি অনেককে, যাদের সকলকেই

আমার বেশ ভাল লেগেছে। আবার এমনও কেউ কেউ আছেন যাদের খেলা দেখার সুযোগ হয় নি আমার! যাদের দেখিনি, তাদের কথা ধরছি না, কেবল মাত্র যাদের দেখেছি তাদের থেকে পঞ্চাশজনকে নিয়ে একটি বিশ্ব ফুটবলের দীর্ঘ তালিকা আমি তৈরি করেছি। হয়ত আমার এই তালিকা অনেকের পছন্দ নাও হতে পারে, হয়ত বাদও পড়তে পারেন কেউ কেউ। তাই বলে এই তালিকা গুণের নিরিখে তৈরি করিনি, করেছি আমি আমার অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে।

প্রথমেই বলি, বিশ্ব ফুটবলে যে সব দেশের বিরুদ্ধে আমি খেলেছি, তাদের সামনে রেখেই এই তালিকা আমার তৈরি। তাই দেশ হিসাবে খেলোয়াড়ের তালিকা আমার করা।

ব্রেজিল—গ্যারিঞ্চা, জেয়ারজিনো, ডিডি, লানটন স্যান্টোস, লুই পেরেরা, জামালা, গারসন, জিটো, কুন্টিনহো, আলতাফানি, রিভেলিনো।

সোভিয়েত—ইয়াসিন, মেত্রেভেলি।

পশ্চিম জার্মানী—বেকেনবাউয়ার, উয়েজিলার।

হাঙ্গেরী—পুসকাস, আলবারটো, বেনে।

আর্জেন্টিনা—ক্যারিজো, ডিস্টিফানো, সিভোরি।

চিলি—ফিগুয়েবোয়া, রেনোসো।

পোল্যাণ্ড—দেনা তোমাজিউইসিকি।

হল্যাণ্ড—ক্রুইফ, নীসকেনস।

স্পেন—সুয়ারেজ, জেনটো।

পর্তুগাল—ইউসোবিও, কোলুনা।

যুগোশ্লাভিয়া—জাজিক, সেকুলারাক।

চেকোশ্লাভিয়া—কাসনাক, ম্যাসোপুসট।

ইতালি—ফ্যাচেটি, রিভেরা।

ইংল্যাণ্ড—ববি মুর, চার্লটন।

ফ্রান্স—কনটাইন, কোপা।

সুইডেন—গনার গ্রেন।

উরুগুয়ে—পেড্রো, রোচা।

আয়ারল্যাণ্ড—জরজ বেসট্।

বেলজিয়াম—ভ্যানহিমসট।

মেকসিকো—কারবাজল।

পঞ্চাশজনের একটা দীর্ঘ তালিকা পেশ করেও, কিন্তু নিজেকে পাশ কাটাতে পারে নি ফুটবলের রাজা। ধূর্ত সাংবাদিকের দল তাকে আবার প্রশ্ন জুড়ে দিয়েছেন আমরা চাই আপনার হাতে বিশ্বদল নির্বাচন। এই মুহূর্তে যদি বলা যায় আপনি বিশ্বদল গড়ুন, তাহলে আপনি সেই দলে কাকে কাকে জায়গা দেবেন ?

এবার সরাসরি প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে ফুটবলের রাজা কলকাতায় সাংবাদিকদের বললেন—আমার নির্বাচন আপনাদের কেমন লাগবে জানি না—তবে নির্বাচন আমি অবশ্যই করবো—ইয়াসিন, গর্ডন ব্যাংকস, জালমা, স্যানটোস, ববি মুর, বেকেনবাউয়ার, জিকো, মাসাউকি, গ্যারিঞ্চা, ববি চার্লটন, ক্রুয়েফ, মিলার, ডিলোস।

রাজার নির্বাচনের পালা শেষ হতেই সবাই দেখলেন সেই তালিকা থেকে বাদ পড়ছেন ষাট দশকের আর একজন ফুটবল অধীশ্বর ইউসোবিও, সেই সঙ্গে পুসকাসও। এই প্রসঙ্গে সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করতে দ্বিধা করলেন না। উত্তরে রাজা জবাব দিলেন—পুসকাসের সঙ্গে আমি খেলিনি। তবে খেলোয়াড় হিসাবে আমি তাকে বড় বলেই জানি—তার প্রতি কোন অশ্রদ্ধা আমার নেই। আর ইউসোবিও—তিনিও একজন দুর্ধর্ষ খোলোয়াড়। শুধু এরা কেন, আমার দল থেকে অনেকেই বাদ পড়েছেন, তার মানে এই নয়, তারা আমার বিচারে খাটো ফুটবলার। কিন্তু একসাথে তো এগারো জনের বেশী নির্বাচন করা যায় না, তাই সকলকে জায়গা দিতে পারলাম না বলে আমি দুঃখিত। আর তাছাড়া উপযুক্ততার সত্যিকার বিচার করতে বসলে নাম তালিকাটি একটি দীর্ঘ মহাভারত হয়ে যাবে।

এরপর তাকে প্রশ্ন করা হলো ব্রেজিলের বিষয়ে। উত্তরে পেলে

বললেন—আমি নেই বলে ব্রেজিল ঝিমিয়ে পড়বে, এটা ঠিক নয়। কারো জন্য কোন কিছুই বেশীক্ষণ আটকে থাকতে পারে না। আমার বদলী জিকো, রিভেলিনো এখন দারুণ খেলছে। তবে বয়সের বিচারে জিকো তরুণ, ওর ভবিষ্যৎ অনেক উজ্জ্বল। কিন্তু ওর মধ্যে নেই রিভেলিনোর মতো অভিজ্ঞতা।

পরিশেষে বলি ফুটবলের বিচার ফুটবলই করবে—আমি কে? আমি তো তার অনুগত দাস মাত্র। বিশ্ব ফুটবলে আপনারা যে আমাকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছেন, আমি তাতেই ধন্য। আমি চাই ফুটবলের প্রচার, প্রসার এবং তার কল্যাণের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে, অবশ্য ঈশ্বর যদি আমার নিবেদিত অর্ঘকে গ্রহণ করেন তবেই আমি ধন্য।

আমি ফুটবলার—তবু তারি মধ্যে আমি মানুষ। আমি চাই মানুষের ভালোবাসা। শিশুদের আমার ভালো লাগে, এই ভালো লাগার মধ্যে কোন জাতিধর্মের বালাই নেই। যা আছে তা হলো নিষ্কাম পবিত্রতা, হৃদয়ের সরল সহজ উদারতা। আমার মতে মানুষের মধ্যে মহৎ গুণ হলো সরল এবং সাধাসিধে জীবন যাপন। আমি তাই চাই সাধারণ ভাবে বাঁচতে, সকলকে কাছে নিয়ে। আমাকে সবাই একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে রাখুক এই আমার কাম্য। অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি আমার ভালো লাগে না। মনে হয় এই রাজসিক আতিশয্য আমাকে যেন তফাৎ করে দিচ্ছে। তাই তোমাদের আবার বলি, আমি একজন সাধারণ মানুষ, চাই তোমাদের সরল সহজ ভালোবাসা, হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিকতা। এই আন্তরিকতাই আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে সাহায্য করে। মানুষে মানুষে আন্তরিকতা যত বাড়বে ততই পৃথিবী থেকে মুছে যাবে হিংসা, লালসা, তাই বলি এস আমরা সমবেত কণ্ঠে বলি—ঈশ্বর আমাদের মানুষ কর। আমাদের মধ্যে সরলতা দাও, দাও আন্তরিক বন্ধুত্ব।

অমরত্ব সবাই চায়—এ বড় কঠিন চাওয়া। আমি জানি

একদিন আমিও মুছে যাব, থাকবে আমার স্মৃতি। সেদিন—সেদিন কি তোমরা আমাকে এই ভাবে ভালোবাসবে—বলবে কি—"এ আর কেউ নয়, আমাদেরই লোক। তাই বলি আমাকে ভালোবাসো, আমি তোমাদের ভালোবাসি, সরল পবিত্র ভালোবাসাই মানুষের মহত্ত্ব, মনুষত্বের অস্তিত্ব।

১লা অক্টোবর। ১৯৭৭।

বিশ্ব ফুটবলের কাছে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। রাজা বিদায় নেবেন। চির বিদায়। বিশ্বফুটবল প্রাঙ্গণ থেকে চিরকালের জন্য চলে যাবেন রাজা, খালি হয়ে যাবে ফুটবলের রাজ সিংহাসন। জাডস নদীর ধার ঘেঁষে তিনতলা স্টেডিয়াম।

ফুলে ফুলে সাজানো।

রাজার বিদায় উপলক্ষে উপস্থিত ছিল সেদিন ৭৫ হাজার হৃদয় বিদীর্ণ দর্শক। তারা সবাই এসেছেন ফুটবলের রাজা—মহান এক মানুষকে বিদায় জানাতে। চোখে তাদের জল, বুকে তাদের গভীর বেদনা। তারি মাঝে মূর্ত হয়ে আছে হাজার খেলার রমণীয় স্মৃতি। স্মৃতি—স্মৃতি বড় বেদনার। বেদনার এই চরম মুহূর্তে রাজা নামলেন মাঠে। শুরু হলো রাজার বিদায়ী উৎসব।

মানুষ আর মানুষ!

গোটা স্টেডিয়াম কানায় কানায় ভরা। উদ্বেল এক হৃদয় মুহূর্ত। খেলার শুরুতে রাজসিক এক ভাবঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে ইউনিসেফের পক্ষ থেকে বিশ্ব নাগরিক—অর্থাৎ "সিটিজেন অফ্ দি ওয়ার্ল্ড" খেতাবে ভূষিত করা হলো রাজাকে।

সম্মান আর সম্মান।

আবেগে কেঁপে ওঠে রাজার বুক।

চোখে জল এসে যায়। বাঁধনহীন আবেগ। রাজাকে বিহ্বল হতে দেখে তার পাশে দাঁড়ালেন বহুদিনের সঙ্গী আলবারতো। সত্তরের জুলে রিমে জয়ী দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। সেদিনও

তিনি এইভাবে আবেগে বিজয় উন্মাদনায় আলিঙ্গন করেছিলেন ফুটবলের রাজা পেলেকে—আজ আবার।

খেলা শুরু হলো।

স্যাণ্টোস বনাম কসমস। অতীতের সঙ্গে বর্তমান। একদিন এই স্যাণ্টোস দলেই কেটেছে রাজার যৌবন। যৌবনের প্রদীপ্ত আলোক রশ্মিতে আজো স্যাণ্টোস যেন রাজার চিত্তকে ঘিরে আছে।

স্যাণ্টোস—রাজার ভাষায়—"ও তো আমার যৌবনের মধুকুঞ্জ, সাধনার সাধন ভূমি।"

আজ রাজাকে খেলার প্রথমার্ধে অংশ নিতে দেখা গেল কসমসের সবুজ জার্সি গায়ে দিয়ে। বিপক্ষে সাদা পোশাকের স্যাণ্টোস দল।

খেলা—এই খেলার গুরুত্ব ফলাফলের চাইতেও অনেক বেশী মূল্যবান, বিশেষ ভাবে ঐতিহাসিক ভূমিকার দিক দিয়ে। স্যাণ্টোস —কসমস, দুই তার কাছে সমান। এ যেন রাজার এক শরীরের দুই অঙ্গ। পঁচাত্তর হাজার দর্শকের সামনে শুরু হলো খেলা। খেলা তো নয় যেন এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত।

শুরুতেই স্যাণ্টোস চেপে ধরলো। বল নিয়ে তারা ঘন ঘন হানা দিতে শুরু করলো কসমস সীমানার মধ্যে। ১৪ মিনিটের মাথায় কসমসের গোলরক্ষক সেফ মেসিং-এর ভুল থ্রোয়িং-এর ফলে গোল সীমানার মধ্যে ফাঁকায় বল পেয়ে গেলেন রুবেল। ফাঁকায় পায়ে বল পাওয়া মাত্র রুবেল আর কালবিলম্ব করলেন না। বলকে পায়ে ধরেই বাড়িয়ে দিলেন রেনাল্ডোকে। তার দুরূহ শটের ফলে ১-০ গোলে এগিয়ে গেল স্যাণ্টোস দল।

এরপর কসমসের আক্রমণে চাপ পড়লো। শুরু করলো তারা একের পর এক আক্রমণ। শেষ বেলায় আবার যেন নতুন প্রাণ উন্মাদনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন পেলে। বল এলো তার পায়ে। শুরু হলো রাজার পায়ে বলের নাচন। জীবনের শেষ খেলায় রাজা আবার নতুন করে প্রমাণ করলেন, তিনি কত মহৎ, কত বড়। তার পায়ের সূক্ষ্ম কাজের সামনে ম্লান হয়ে গেলেন অনেকেই। তার

বাড়ানো বল থেকে গোলের সুযোগ পেলেন ক্লিনাকিয়া। কিন্তু বল নিয়ে তিনি ঠিকমতো এগুতে পারলেন না। পিছন থেকে তাকে অবৈধভাবে বাধা দেওয়ায় কসমস পেলো ডাইরেক্ট ফ্রি-কিক। তেতাল্লিশ মিনিটের মাথায় আটত্রিশ গজ দূর থেকে শট নিলেন পেলে।

সামনে দাঁড়ানো স্যাণ্টোস দলের সাত সাতজন খেলোয়াড়—খেলোয়াড়ের প্রাচীর।

নিজের হাতে ফ্রি-কিকের জন্য বল বসালেন রাজা। একবার দেখে নিলেন চারদিক। আবেগে থরথর করে কাঁপছে গোটা শরীর। মাঠ স্তব্ধ!

কয়েক পা ছুটে এসে ডান পায়ে নিচু শট করলেন রাজা। পায়ের সঙ্গে বলের সংযোগ মাত্র রকেট গতিতে বলটা মানুষের প্রাচীর টপকে বাতাসে গোত খেয়ে ঢুকে গেল গোলের মধ্যে।

গোল···গোল···জীবনের শেষ খেলায় গোল করলেন রাজা। এই গোলের ফলে তার গোল সংখ্যার হিসাব দাঁড়ালো ১২৭৮টি।

গোলের সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলেন খেলোয়াড় বন্ধুরা। বুকে জড়িয়ে ধরলেন রাজাকে। মাঠের অগণিত মানুষ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে অভিনন্দিত করলেন। করতালির মধ্যে ডুবে গেল সারামাঠ।

বিরতির বাঁশি বাজলো।

গায়ের থেকে রাজা খুলে ফেললেন কসমসের দশ নম্বর জার্সিটি, তুলে দিলেন বৃদ্ধ পিতার হাতে।

এবার গায়ে চাপিয়ে নিলেন স্যাণ্টোসের সাদা জার্সি। একদিন এই জার্সি গায়ে চাপিয়ে বিশ্ব রণাঙ্গনে তিনি বহুবার আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভাবতে গিয়ে জল এসে যায় দুচোখে। সামলে নিলেন নিজেকে।

বিরতির পর খেলা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ছাপিয়ে নামলো বৃষ্টি। বৃষ্টি আর বৃষ্টি। ওই অবস্থায় রাজকীয় অনুষ্ঠান কিন্তু বাদ গেল না। বৃষ্টির মধ্যে ব্রেজিলের নর্তক ও ব্যাণ্ড বাদকদের

দাবিয়ে রাখতে পারলো না। রাজার বিদায় বেলায় তারা নাচ-বাজনা দিয়ে অভিনন্দন জানালেন পেলেকে।

বিরতির পর খেলা শুরু হলো।

এবার রাজা মাঠে নামলেন স্যান্টোসের জার্সি গায়ে দিয়ে। প্রথমার্ধে কসমস ব্যবহৃত জার্সিটি তুলে দিয়েছেন বৃদ্ধ পিতার হাতে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই জার্সিটি পেলের গ্রাম টেসকোরাকোসে "পেলে মিউজিয়ামে" রাখা আছে।

দ্বিতীয়ার্ধের খেলাটি চরম উত্তেজনার মধ্যে শেষ হলো। দ্বিতীয়ার্ধে একটি মাত্র গোল হয়। গোলটি করলেন পেলের বদলী কসমসের র‍্যামন মিফলিন। আর এই গোলেই শেষ হলো পেলে অধ্যায়ের এক স্মরণীয় ঐতিহাসিক মুহূর্ত। পেলে—ফুটবলের রাজা। চির বিদায়। বিশ্বফুটবল থেকে চিরকালের জন্য সমাপ্তি ঘটলো ঐতিহাসিক পেলে অধ্যায়ের।

খেলার শেষ বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে পেলে এগিয়ে গেলেন শিক্ষা-গুরু বিট্রোর দিকে। এগিয়ে এলেন বিট্রো। চোখে জল। দুহাত বাড়িয়ে মহান উদার গুরু বুকে টেনে নিলেন তার আদরের প্রিয় শিষ্যকে। এ এক মহামিলনের দৃশ্য—করুণ হলেও তা আন্তরিক! গুরু শিষ্যের মিলন। এই মিলন চিত্র যেমন মধুর, তেমনি হৃদয়-বিদারক।

ধীরে ধীরে নিজের গা থেকে স্যান্টোস ব্যবহৃত সাদা দশ নম্বর জার্সিটি খুলে ফেললেন রাজা। নতজানু হয়ে বসলেন গুরুর পায়ের কাছে। তারপর আন্তরিক করপুট অঞ্জলিতে সেই জার্সিটি নিবেদন করলেন গুরুর পায়ে। চোখের জল যেন বাঁধ মানে না।

শিষ্যকে আকুল আবেগে বুকে তুলে নিলেন মহান গুরু। এরপর রাজা প্রস্তুত হলেন চির বিদায়ের জন্য। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন মাঠের একধারে।

অবিরাম বৃষ্টি।

বৃষ্টির দুর্বার ধারাকে অস্বীকার করেও সেদিন অগণিত মানুষ,

উদ্বেল আবেগে বিদায় জানালেন রাজাকে। আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন দর্শকেরা।

রাজা চলে যাচ্ছেন। চলে যাচ্ছেন বিশ্ব ফুটবল প্রাঙ্গণ থেকে—এ বিদায় চিরবিদায়।

রাজা ছুটছেন, পিছনে ছুটছেন স্যাণ্টোস ও কসমসের খেলোয়াড়েরা, তারপর রাজাকে তারা সকলে মিলে তুলে নিলেন কাঁধে। দুহাতে মুখ ঢাকলেন রাজা।

চোখের জল বৃষ্টির অবিরাম ধারায় মিশে গেল। দেখতে দেখতে অগণিত মানুষের উদ্বেলিত হৃদয়ের অভিনন্দন কুড়িয়ে একসময় ফুটবলের রাজা অদৃশ্য হয়ে গেলেন স্টেডিয়ামের ভূ-গর্ভস্থ পথে।

গোটা মাঠ স্তব্ধ। বিমোহিত। কারো মুখে কোন কথা নেই। বেদনায় মূর্ত শত শত হৃদয়, রাজা নেই। আর তিনি আসবেন না। আর তাকে কোনদিনের জন্য দেখা যাবে না ফুটবল প্রাঙ্গণে। এই বিদায়—চিরবিদায়—।

পেলে—মহান পেলে। ফুটবল প্রাঙ্গণের স্মরণীয় এই মহান পেলের অধ্যায়ের হলো পরিসমাপ্তি। মোট খেলার সংখ্যা ১৩৬৩টি। আর এই খেলায় তিনি গোল করেছেন ১২৭৮টি।

খেলার পর শুরু হলো সাংবাদিক সম্মেলন। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ থেকে সাংবাদিকেরা এসেছিলেন রাজার বিদায় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে।

পরনে বাদামী রঙের স্যুট।

সাংবাদিকের মাঝখানে এসে বসলেন বিদায়ী সম্রাট। চোখের কোলে জল। আবেগে কাঁপছে বুক। মুখে কোন কথা নেই। কণ্ঠ ধরে আসে। কি জবাব দেবেন তিনি। তবু তাকে কিছু বলতে হবে। সবাই যে কিছু শুনতে চায়। আবেগ ঘন কণ্ঠে রাজা অবশেষে মুখ খুললেন। বলতে লাগলেন,—হে আমার অনুরাগীরা, আমি তোমাদের ভালোবাসায় কৃতজ্ঞ। তোমরা আমাকে যা দিয়েছো, তার ঋণ আমি

কোনদিন শোধ করতে পারবো না। ভালোবাসার ঋণ শোধ করার মতো স্পর্ধা আমার নেই। জীবনে আমি যা পেয়েছি, তা ঈশ্বরের অপার করুণায়। তিনি আমায় দুহাত ভরে দিয়েছেন। ঈশ্বরের এই কৃপা অনুগ্রহে আজ আমি পরিপূর্ণ—সেই কারণে নতুন করে কিছু পাওয়ার ইচ্ছে যেমন আমার নেই তেমনি নেই কোন চাওয়ার প্রত্যাশা। আমি তাকে যেমন এতদিন প্রতিটি মুহূর্তে উপলব্ধি করেছি, সেইভাবেই যেন অনুভব করতে পারি।

পেলের এই ঐতিহাসিক বিদায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বের আর এক বরেণ্য পুরুষ—মহম্মদ আলী।

একজন সাংবাদিক পেলের সঙ্গে মহম্মদ আলীর তুলনা করে প্রশ্ন করতেই পেলে মুহূর্তের জন্য থমকালেন। তারপর স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন মুষ্টিযোদ্ধা আলীর দিকে। মুহূর্তকাল মাত্র। কেঁপে উঠলো ফুটবলের রাজার ওষ্ঠদ্বয়। তিনি আবেগ মিশ্রিত কণ্ঠে আলীর দিকে আঙুল তুলে বললেন—আপনারা সবাই দেখুন, উনি (আলী) কাঁদছেন। আমিও পারছি না আর নিজেকে ধরে রাখতে। আমরা দুজনই সমান—দুজনেই কৃষ্ণাঙ্গ—দুই ভাই।

এরপর দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে পেলে বললেন—আমি আমার নিজের জন্য কখনও গর্ব করিনি, করতেও চাই না। কেন গর্ব করবো—কিসের জন্য, আমার যা কিছু সবই তো তারই দেওয়া—তার কৃতজ্ঞতার দান। আমাকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন যে শক্তিমান পুরুষ, আমি তার ইচ্ছের দ্বারা চালিত। তিনি যে ভাবে এতদিন আমায় নিয়ে চলেছেন, সেই ভাবে আমি চলেছি। এখন আবার যে ভাবে নির্দেশ দেবেন, সেই ভাবে চলবো।

আমার কাছে ভালোবাসাই হলো আসল। এই ভালোবাসার জোরেই আমরা বাঁচি—বেঁচে আছি। ভালোবাসা আমায় টানে, মানুষকে কাছে পাই। আমার কাছে জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে সবাই সমান। সবাই মানুষ,—প্রত্যেকেই অমৃতের পুত্র—আপনজন। ফুটবলের ভালোবাসায় বিশ্ব আমার কাছে ধরা দিয়েছে, আপন হয়েছে

বিশ্ববাসী। আমি তাই ফুটবলের মধ্য দিয়ে গড়ে তুলতে চাই দেশে দেশে সংহতি, মৈত্রী—বন্ধুত্ব। মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রেম, আন্তরিকতাই পারে—বিশ্বমৈত্রী গড়ে তুলতে।

মানব কল্যাণে মহান পেলের আদর্শ যে শ্বেতাঙ্গ আমেরিকাবাসীর চিত্তের চেতনা জাগ্রত করেছিল তা বোঝা গেল আন্তর্জাতিক গুণীজন সংবর্ধনায় যখন তার হাতে তুলে দেওয়া হলো—"শান্তি পুরস্কার"। ১৯৭৮ সালে কালোরাজা পেলে তাবৎ তুনিয়ার বুকে রচনা করলেন এক ঐতিহাসিক নজির, যা কোন খেলোয়াড়ের পক্ষে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। মহান পেলে তাই অদ্বিতীয় অমর নায়ক—যার অমরত্বের মধ্যেই হবে ভবিষ্যৎ ফুটবলের জয় যাত্রা।

পেলের পরিচয় লিপি

আসল নাম—এডসন অ্যারেন্টস ডু-নাসিমেন্টো।

ডাক নাম—পেলে, ব্ল্যাক পার্ল, ব্ল্যাক সিজার, সানগড, সাসি ও ডিকো।

দর্শকদের নাম—পেলে।

সাংবাদিকদের দেওয়া নাম—কিং অফ ফুটবল।

জন্ম তারিখ—২৩শে অক্টোবর, ১৯৪০।

জন্মস্থান—ব্রেজিলের মিনাস গেরাইস অঞ্চলের টেসকেরাকোস গ্রাম।

উচ্চতা—৫', ৮½"। ওজন—১৬৫ পাউণ্ড। জার্সির নম্বর—দশ।

সন্তান—তুটি সন্তান। কন্যা কেলি খ্রীশ্চিনা, পুত্র এডিসন।

শিক্ষাগুরু—প্রথম গুরু বাবা ডোণ্ডিনহোর এবং পরে ওয়েলডেমার ডি-ব্রিটো। পরে ব্রেজিলের কোচ ফিওলা।

খেলা শুরু—১৯৫১ সালে স্যান্টোস দলের হয়ে।

প্রথম জাতীয় খেলা—১৯৫৭ সালে ব্রেজিলের হয়ে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে।

প্রথম বিশ্বকাপ—১৯৫৮ সালে।

মোট বিশ্বকাপ—চার বার। ১৯৫৮, ৬২, ৬৬, ৭০ সাল।

অনুশীলন—ছয় থেকে সাত ঘণ্টা।

পেলের হবি—গ্রামাফোন বাজাতে ভালোবাসেন। গান তার প্রিয়। হাজার রেকর্ড তার ঘরে মজুত। ১৯৭০ সালে ৭ই সেপ্টেম্বর ব্রেজিলের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পেলের একটা গানের রেকর্ড বাজারে আত্মপ্রকাশ করেছে।

প্রথম শ্রেণীর খেলায় গোল সংখ্যা—১২৭৮টি।

জাতীয় দলের হয়ে গোলসংখ্যা—১১১টি গোল ৯৬টি খেলায়।

সম্মান—১৯৭০ সালে কিং অফ ফুটবলার। এই সোনার মুকুটের পরিমাণ হলো নিখাদ সোনায় তৈরি ৪ পাউণ্ড ওজনের একটা বল সহ মুকুট, হীরের আংটি। ১৯৭৮ সালে বিশ্বের সেরা সম্মান—শান্তি পুরস্কার।

আয়কর—মাসে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা।

শেষ খেলা—১লা অক্টোবর ১৯৭৭—নিউইয়র্ক। স্যাণ্টোস বনাম কসমস খেলা। পেলের মোট গোল সংখ্যা কত?—দুই হাজারের মতো।

লণ্ডনে আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানে ফুটবল বাদশা পেলে তার জীবনে কয়েকটি স্মরণীয় জিনিস পাঠিয়েছিলেন বিশেষ শর্ত-সাপেক্ষে। পেলের এই ব্যবহৃত প্রিয় জিনিসগুলি যাতে সাবধানে থাকে তার জন্য লণ্ডনের লয়েডস কোম্পানীতে ইনসিওর করা হয়।

যে দামে এইগুলি বীমা করা হয়েছে তার মোট হিসাব—

যে জার্সিটি পরে হাজার গোল করতেন—	৩০,০০০ হাজার ডলার
যে জার্সিটি পরে বিশ্বকাপে খেলেছেন—	৩০,০০০ হাজার ডলার
যে বলটিতে একহাজার গোল হয়—	৬০,০০০ হাজার ডলার
১৯৭০ সালে যে বুট পরে বিশ্বকাপ খেলেন—	২০,০০০ হাজার ডলার
বিশ্বকাপ খেলায় ব্যবহৃত মোজা ও প্যাণ্ট—	২০,০০০ হাজার ও ৩০,০০০হাজার ডলার

পেলের হাজার গোলের খতিয়ান

(১৯৫৬—৬৯)

	'৫৬'	৫৭'	৫৮'	৫৯'	৬০'	৬১'	৬২'	৬৩'	৬৪'	৬৫'	৬৬'	৬৭'	'৬৮	৬৯'	মোট
ব্রেজিল জাতীয় দল	০	২	৯	১১	৪	০	৮	৭	২	৯	১	০	৪	৭	৬৮
ব্রেজিল চ্যাম্পিয়ানশীপ	০	০	০	০	৭	০	০	০	০	০	০	০	০	০	৭
পুল চ্যাম্পিয়ানশীপ	০	৩৬	৫৩	৪৬	৩১	৪৭	৩৭	২১	৩৪	৪৯	১২	১৫	১৭	২৬	৪২৬
ব্রেজিল আর্মি	০	০	০	১৪	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১৪
দক্ষিণ আমেরিকার ওয়ার্ল্ড কাপ	০	০	০	০	০	০	৯	৭	০	৯	০	০	০	০	২৫
টেকা-ডি. প্রাটা টুর্নামেণ্ট	০	৪	৮	৬	০	৯	০	১৪	৩	৫	০	৯	১১	১১	৮২
ব্রেজিলিয়ান কাপ	০	০	০	২	০	৭	৪	৬	৭	২	২	০	০	০	৩০
আন্তর্জাতিক ফ্রেণ্ডলী	০	১	১৩	৪৬	৩১	৩৫	৩৩	১৯	১৬	১৬	১৯	২৪	১	১৫	২৬৯
অন্তঃ ব্রেজিল ফ্রেণ্ডলী	২	২২	০	০	০	৯	৬	৭	০	১৭	২	৭	৫	৫৪	৭৯
	২	৬৫	৮৩	১২৭	৭৪	১০৭	৯৭	৮২	৬২	১০৭	৪০	৫৩	৩৯	৬৪	১০০০